ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যিম্মায় (নিরাপত্তা ও হেফাযতে) থাকেন। তারা হ'লেন- (১) যিনি আল্লাহর ঘর মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন (২) যিনি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) বের হন এবং (৩) যিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন' *(ছহীহুল জামে' হা/৩০৫১)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৯তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০২৬

হজ্জের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ

তাফসীরুল কুরআন (সূরা আলে ইমরান, নিসা ও মায়েদাহ)

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাফসীরটির বৈশিষ্ট্য:

- বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর, যা ছহীহ হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে প্রণীত।
- সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত, যেখানে কুরআনের ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- তাফসীরকারকদের আক্বীদাগত বিচ্যুতি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে পাঠকদের সতর্ক করার জন্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য সংযোজন করা হয়েছে।

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন’ *(বুখারী হা/৪৫০)*।

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ও গাঁথুনি সম্পন্ন হয়েছে গ্রীল, থাই, টাইলস, পেইন্ট ইত্যাদি বাকী আছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

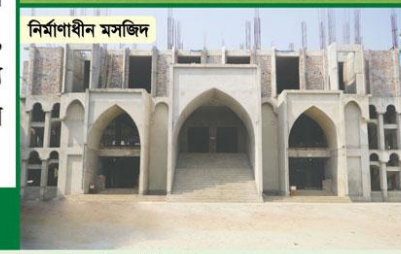

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ISSN : 3105-4137

রেজি: নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ	১৪৪৭ হি.
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৪৩৩ বাং
মে	২০২৬ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
একাউন্ট নং : Masik At-Tahreek, 00712200 00115, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
  (বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয় :**
▶ আদর্শিক নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা ০২

◆ **প্রবন্ধ :**
▶ হজ্জ সফরে ধৈর্যের পরীক্ষা ০৩
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
▶ রিয়া : কারণ ও প্রতিকার *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৭
-ড. নূরুল ইসলাম
▶ যেমন ছিল সালাফদের হজ্জ-ওমরাহ ১২
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
▶ মাসায়েলে কুরবানী ২০
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◆ **প্রচ্ছদ রচনা :**
▶ হজ্জের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ২৩
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◆ **অর্থনীতির পাতা :**
▶ তাওহীদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা : বিশ্বাস ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব ২৯
-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

◆ **শিক্ষাঙ্গন :**
▶ প্রবন্ধ রচনা : কলাকৌশল ও চর্চা ৩৩
-সারওয়ার মিছবাহ

◆ **চিকিৎসা জগৎ :**
▶ হামের প্রাদুর্ভাব : কারণ, লক্ষণ ও করণীয় ৩৬
-ডা. মেহেদী হাসান মনিম

◆ **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
▶ যুগে যুগে কুরবানী : আত্মত্যাগের চিরন্তন ইতিহাস ৩৭
-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

◆ **কবিতা :** ৪০
▶ হজ্জের আহবান
▶ আয়াতের স্পর্শে ভোর
▶ কুরবানীর চেতনা
▶ মুফতীর বাজার

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
◆ **মুসলিম জাহান** ৪২
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

আদর্শিক নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা

আমাদের এই সম্পাদকীয় কলামের মূল সূর থাকে আত্মশুদ্ধিতা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার প্রতি জাতিকে সজাগ করা। আমরা আকাশের পাখি নই বা জঙ্গলের বাঘ নই কিংবা নদীর মাছ বা কুমির নই। আমরা সমাজে বসবাসকারী মানুষ। তাই সমাজকে নিয়েই আমাদের যত ভাবনা। একাত্তরের যুদ্ধ দেখেছি। বাহাত্তর থেকে গত ৫৫ বছরের রাজনীতি দেখেছি। এখনও দেখছি। প্রায় সব নেতাই কমবেশী দেশের কল্যাণে কাজ করেছেন। পৃথিবীর সর্বাধিক ভোট পাওয়া নেতা হলেন ৩জন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিব মাত্র ১০০ জন ফ্রেশ লোক চেয়েছিলেন, যাদের নিয়ে তিনি দেশ চালাবেন। কিন্তু পাননি। অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'লোকেরা পায় সোনার খনি, আর আমি পেয়েছি চোরের খনি'। ১২ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের পর গণতন্ত্রে উত্তরণের গত ৬৪ দিনের ফলাফল পত্রিকার শিরোনাম অনুযায়ী 'আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি: মনিটরিং নেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-আইজিপির': চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মব সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নির্যাতন, খুন, অপহরণ, রাহাজানি ও কিশোর গ্যাং কালচারে জনজীবন দুর্বিষহ'। পুলিশের তথ্যমতে তালিকাভুক্তদের প্রায় ৯০ শতাংশই কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা ব্যক্তি'। কিছুই বলার নেই। পরবর্তী চাওয়া কি? উত্তর নেই।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধ্বংসকারী দুই নেতা হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইস্রাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামীন নেতানিয়াহু। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে চলছে হাযার হাযার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল। খোদ আমেরিকায় একদিনে ৮০ লাখ মানুষ মিছিল করেছে। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধেও তার দেশে সমানে মিছিল হচ্ছে। বহু লোক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেছে। তাতেও নেতারা বোমা বর্ষণ ও নিরীহ মানুষ হত্যা বন্ধ করেননি। কেননা তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েই যাবেন। আর তাই আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসো-র প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম ত্রাওয়ে বলেছেন, গণতন্ত্র কোন সমাধান নয়। এটি একটি 'মিথ্যা' ব্যবস্থা মাত্র। গণতন্ত্র মানুষ হত্যা করে ও ধ্বংস ডেকে আনে। পশ্চিমা দেশগুলো যেখানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে সেখানেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। তিনি মুয়াম্মার গাদ্দাফির পরবর্তী লিবিয়ার অস্থিতিশীলতাকে গণতন্ত্রের ব্যর্থতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন এবং বলেন, আফ্রিকার মানুষ এ ব্যবস্থা চায় না'। যুদ্ধ বন্ধে পাকিস্তানের উদ্যোগে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির সময়সীমা ও শান্তি আলোচনার ভবিষ্যৎ নিয়েও রয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। যদিও হামলাকারী আমেরিকা এখন বিশ্বব্যাপী কোনঠাসা।

বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতা নিয়ে এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে অ্যামনেস্টি তাদের ২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামীন নেতানিয়াহুর তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, তাঁদের কর্মকাণ্ডের ফলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে পড়েছে'। অথচ আমেরিকা ও রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম ভেটো ক্ষমতাধারী স্থায়ী সদস্য। ফলে তাদের হাতেই বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা যিম্মী হয়ে আছে। দায়িত্বশীলতার যে গুণ তাদের মধ্যে থাকা অপরিহার্য ছিল, সেটি পরিদৃষ্ট হয়না।

সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার ও সুশাসন চায়। সেটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন নেতা-কর্মী সবাই প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে ভয় করবে। মৃত্যু পরবর্তীকালে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহিতাকে ভয় পাবে। সর্বদা নিজের হাত-পা ও ত্বক-এর মত অবিচ্ছেদ্য স্বাক্ষীকে ভয় পাবে। কারণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, 'আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব। আর আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও সাক্ষ্য দিবে তাদের পা, তাদের কৃতকর্ম বিষয়ে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। যখন যালেম ভাববে যে, পরকালে আমাকে শাস্তি পেতেই হবে, কেবল তখনই সে যুলুম থেকে হাত গুটিয়ে নিবে। আর এটিই হ'ল কুরআনের মহা সংবাদ *(নাবা ৭৮/১-২)*।

নেতৃত্ব ও আনুগত্য ছাড়া সমাজ চলে না। এটা আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা। নেতাদের অবস্থান গাড়ির চালকের মতো। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আমানত ধ্বংস হবে এবং অযোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর' *(বুখারী হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। তিনি সাবধান করে বলেন, 'তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পাই পথভ্রষ্ট নেতাদের' *(আবুদাঊদ হা/৪২৫২)*। অতঃপর নেতা-কর্মী উভয়কে সাবধান করে তিনি বলেন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তিনি বলেন, মানুষকে ধ্বংস করে তিনটি বস্তু। প্রবৃত্তিপূজা, লোভের দাসত্ব এবং আত্মম্ভরিতা। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫১২২; ছহীহাহ হা/১৮০২)*। তিনি বলেন, যাকে আল্লাহ নেতৃত্ব দান করেছেন, অথচ সে তার অধিনস্তদের প্রতি খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৮৬)*। তিনি বলেন, 'দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী ধ্বংসকর মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য' *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৫১৮১)*।

পরিশেষে বলা যায়, যিনি যতটুকু দায়িত্বশীল, তাকে সেই আমানতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেতন ও আদর্শ রূপকার হ'তে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে মহান আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার ভয়ই পারে একজন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে। বর্তমান অস্থিতিশীল প্রেক্ষাপটে তাই রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে নির্লোভ, সৎ, আমানতদার ও আল্লাহভীরু নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। এই আদর্শ গুণাবলীসম্পন্ন নেতাকর্মীদের সংখ্যা যত বাড়বে, সমাজ ও রাষ্ট্র ততই ন্যায়বিচারপূর্ণ ও শান্তিময় হয়ে উঠবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।- আমীন! *(স.স.)*।

হজ্জ সফরে ধৈর্যের পরীক্ষা

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের অন্যতম হচ্ছে হজ্জ। হজ্জ ইবাদতে মালী বা অর্থনৈতিক ইবাদত। কেবলমাত্র সামর্থবান বান্দার উপরই হজ্জ এর বিধান প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 'আর আল্লাহ্র জন্য লোকদের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরয করা হ'ল, যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। এ সামর্থ্য যেমন অর্থনৈতিক, তেমনি শারীরিকও বটে। কেননা হজ্জ একটি শারীরিক পরিশ্রমের ইবাদত। একইভাবে এটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী পালনযোগ্য ইবাদত।

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা যেমন ব্যাপক, তেমনি এর পরিধি বা সীমাও বিস্তর। মক্কা, মিনা, আরাফা, মুযদালিফা প্রভৃতি এলাকা ঘিরে মোটামুটি পাঁচদিন ব্যাপী চলে এর মূল আয়োজন। সমাগম ঘটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের লক্ষ লক্ষ মুছল্লীর। যারা কিনা 'যুয়ূফুর রহমান' বা মহান আল্লাহ্র মেহমান। হজ্জের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যে বিষয়টির সেটি হচ্ছে ছবর বা ধৈর্য। তাওয়াফ, সাঈ, মিনায় অবস্থান, আরাফায় গমন, মুযদালিফায় খোলা আকাশের নীচে রাত্রী যাপন, জামরায় কংকর নিক্ষেপ সব জায়গাতেই প্রয়োজন শুধু ছবর আর ছবর। তারও আগে থেকে বলতে গেলে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় ছবরের পরীক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, আমরা অধিকাংশই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারিনা। কিছুটা মু'আল্লিম বা গাইডদের ত্রুটি, কিছুটা আমাদের হাজীদের বাড়াবাড়ি। সবমিলিয়ে শেষতক হজ্জ যেন সঊদী আরবেই রেখে খালি হাতে ফিরে আসা হয়। যা কোনভাবেই কাম্য নয়। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা হজ্জ সফরে ধারাবাহিকভাবে ধৈর্যের কিছু নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

হজ্জের ফযীলত : আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 'আর তুমি জনগণের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হতে' *(হজ্জ ২২/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে, যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হ'তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল'।[১] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ 'এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের (ছগীরা গোনাহ সমূহের) কাফফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[২]

ছবরের গুরুত্ব : হজ্জব্রত পালন করতে যেমন প্রয়োজন শারীরিক সক্ষমতা, তেমনি প্রয়োজন চূড়ান্ত ছবর বা ধৈর্যধারণ করা। মূলত মুমিনের সামগ্রিক জীবনটাই ধৈর্যের পরীক্ষাগার। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মুমিনের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। তার সব কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। যখনই তার সামনে প্রফুল্ল সময় উপস্থিত হয় তখন সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যদি দুর্ভোগ উপস্থিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে, ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়'।[৩]

ধৈর্যধারণের নির্দেশ প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। ধৈর্যের ক্ষমতা এতটাই বেশী যে, সত্যিকার অর্থে ধৈর্যধারণ করতে পারলে চরম শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ- وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ 'ভাল ও মন্দ সমান হ'তে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। তখন দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা মহা ভাগ্যবান' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)*।

ধৈর্য এক মহৎ গুণ। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا يَكُنْ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ لاَ أَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ،

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৭।*

২. *বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯, মিশকাত হা/২৫০৮।*

৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৭।*

وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ 'আমার কাছে যা কিছু কল্যাণ রয়েছে তা আমি তোমাদের বঞ্চিত করে আগলিয়ে রাখব না। যে ব্যক্তি পাপমুক্ত হ'তে চায় আল্লাহ তাকে পাপমুক্ত করেন। যে ব্যক্তি মানুষের পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষিহীন করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করে দেন। কোন ব্যক্তিকে যা কিছু দান করা হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্ববৃহৎ হ'ল ধৈর্য'।[৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, "..وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ رواه مسلم 'ছাদাক্বা হ'ল দলীল, ধৈর্য হ'ল আলো। আর কুরআন হ'ল তোমার পক্ষে বা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ'।[৫]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاعْلَمْ أَنَّ فِى الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 'জেনে রেখ! তোমার নিকট অপসন্দনীয় কোন ব্যাপারে যদি তুমি ধৈর্য ধারণ কর তবে তাতে তোমার জন্য রয়েছে অনেক কল্যাণ। আর নিশ্চয়ই বিজয় আসে ধৈর্যের সাথে এবং বিপদের সাথে রয়েছে বিপদমুক্তির পথ। আর কাঠিন্যের পর সহজ আসে'।[৬] একই মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الَّذِى يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ 'যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে সে ব্যক্তি অধিক ছওয়াবের অধিকারী ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে মানুষের সাথে মেশে না এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না'।[৭] অতএব ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে কবুলযোগ্য করতে হ'লে মহান রবের দরবারে এর ষোলআনা প্রতিদানের প্রত্যাশী হাজী ছাহেবদের অবশ্যই দীর্ঘ হজ্জ সফরে এবং এই সময়কালীন ইবাদত-বন্দেগীতে ছবরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। নিবন্ধের এই পর্যায়ে আমরা হজ্জের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবরের ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পাব।-

হজ্জ সফরে ধৈর্যের পরীক্ষা :

প্রস্তুতি : হজ্জ এমন এক ইবাদত যা পালনে যেমন বেশ সময় লাগে, তেমনি এর প্রস্তুতিতেও লাগে বেশ অনেক দিন। আর্থিক যোগান, মানসিক প্রস্তুতি, হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নেয়া সবমিলিয়ে হজ্জ সফরের পূর্বেই চলে বেশ আয়োজন। প্রহর গুণতে থাকেন কবে আসবে সেই কাংখিত দিন, যেদিন মহান রবের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে, সচক্ষে আল্লাহ্র ঘরকে সামনে রেখে ছালাত আদায়ের পরম তৃপ্তি পূরণের বাসনা নিয়ে সঊদী আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। দিন যেন পার হ'তেই চায় না। দীর্ঘ ছবরের পর অবশেষে সেই দিন আসে। শুরু হয় হজ্জের সফর। বাস্তবে শুরু হয় ছবরের পরীক্ষা। কেননা হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় বাড়ীতে ফিরে আসা পর্যন্ত চলে ছবরের এক দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হ'তে পারেন তিনিই মূলত 'হজ্জে মাবরূর' লাভে ধন্য হবেন বলে আশা করা যায়। যার প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ 'হজ্জে মাবরূর বা কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[৮]

ঢাকা-জেদ্দা : হজ্জ সফরের শুরুতেই ছবরের একটি বড় পরীক্ষা দিতে হয়। অধিকাংশ হাজীদের বাড়ী থেকে একদিন আগেই পৌঁছতে হয় ঢাকার আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে। বিশেষ করে ঢাকার বাইরের হাজীদেরকে। একদিনের সফর এখানেই হয়ে যায়। অতঃপর বিমানের সিডিউল অনুযায়ী শুরু হয় প্রস্তুতি। অন্তত তিন ঘণ্টা আগে ইমিগ্রেশন করতে হয়। অনেক সময় বিমানের সিডিউল বিপর্যয় ঘটলে একাধিক দিনও হজ্জ ক্যাম্পে থাকতে হয়। এতেই অনেকে বিরক্ত হয়ে যান। যাই হোক ইমিগ্রেশনের পর থেকে মূল সফর শুরু হয়। ঢাকা থেকে সরাসরি জেদ্দা ফ্লাইট হ'লে বিমানে ভ্রমণ করতে হবে সাড়ে ছয় ঘণ্টা থেকে সাত ঘণ্টা। আর ট্রানজিট বিমান হলে অর্থাৎ মাঝখানে কোন দেশের (যেমন দুবাই, কাতার বা শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশের) বিমান বন্দরে বিরতী দিলে সেই ট্রানজিটের সময় অনুযায়ী সময় বৃদ্ধি পাবে। ট্রানজিটে বাড়তি বিড়ম্বনা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিমান বন্দরে নামা আবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় নিয়ম মেনে পুনরায় বিমানে ওঠা। উল্লেখ্য যে, ট্রানজিট বিমানে ভাড়ার পরিমাণ কিছুটা কম লাগে বলে হজ্জ কাফেলাগুলো অনেকক্ষেত্রে এই বিমানগুলো বেছে নেন। অথবা ডাইরেক্ট বিমানের সিডিউল না পেলে বাধ্য হয়ে অনেকে ট্রানজিট বিমানে টিকেট করেন। আমি নিজেও ২০১১ সালে দুবাই ট্রানজিট হয়ে হজ্জে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময় ১১ ঘণ্টা এবং আসার সময় ৩ ঘণ্টা ট্রানজিট ছিল। এতে নতুন একটি বিমান বন্দর দেখার সুযোগ হ'লেও বিড়ম্বনাও নিদেন পক্ষে কম নয়।

অতঃপর জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছে ইমেগ্রেশনের জন্য লাইনে দাড়াতে হয়। ইমিগ্রেশন ও আনুসাঙ্গিক কার্যক্রম শেষে যেতে হবে বাংলাদেশ প্লাজায়। সেখানে গিয়ে আরেক বিড়ম্বনা শুরু হবে। শত শত হাজী অপেক্ষার প্রহর গুণছেন কখন তারা আসল গন্তব্য মক্কায় পৌঁছবেন এবং ওমরাহ পালন করবেন। বাংলাদেশ প্লাজা হচ্ছে সুউচ্চ তাঁবুর নীচে

৪. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৪।*
৫. *মুসলিম হা/২২৩; ছহীহুল জামে' হা/২৪০৩।*
৬. *আহমাদ হা/২৮০৪।*
৭. *ছহীহুল জামে' হা/৬৬৫১।*
৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।*

উন্মুক্ত স্থান। যেখানে বসার জন্য কিছু ঢালাই করা বেঞ্চ রয়েছে। এসির কোন ব্যবস্থা নেই। গরমেও বেশ কষ্ট হবে। এবারে অপেক্ষা করতে হবে কখন নির্ধারিত গাড়ী আসবে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। গাড়ী আসলে হোটেলের ঠিকানা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে পাঠানো হবে। কারো কাগজপত্রে সমস্যা বা ঠিকানার কমবেশী থাকলে তাকে লাইন থেকে বের করে একপাশে বসিয়ে রাখবে। সবশেষে তাদেরকে পাঠানো হবে। একবার আমি সহ বিভিন্ন কাফেলার কয়েকজনের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছিল। কাফেলার অন্যান্য সদস্যরা দুপুরের পর পর চলে গেলেও আমাদেরকে মাগিরব পর্যন্ত বসিয়ে রেখে অবশেষ পৃথক একটা মাইক্রো দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। হোটেলে পৌঁছতে রাত আট-টা বেজে গিয়েছিল। সেবার খুব বিরক্ত হয়েছিলাম তবে ধৈর্য হারাইনি। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনা বা সঠিক ঠিকানা ব্যতীত কাউকে মক্কায় পাঠানো হয়না এবং অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে হাজীদেরকে তাদের সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই দায়িত্বশীলতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সবমিলিয়ে জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছার পরও কয়েক ঘণ্টা চলে যাবে এখান থেকে বের হ'তে।

এরপর নির্ধারিত মু'আল্লিমের স্টিকারযুক্ত গাড়ীতে করে উচ্চশব্দে ও সমস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কাভিমুখে ছুটবে কাফেলা। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ্‌র ঘর স্বচক্ষে দেখার তীব্র আকাংখার অনুভূতি। পথিমধ্যে আল্লাহ্‌র মেহমানদের বিভিন্ন পয়েন্টে খেজুর-পানি, জুস ইত্যাদি হাদিয়া দেওয়া হবে। মু'আল্লিম নম্বর, হোটেলের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত হ্যান্ড বেইল্ট ও গলায় ঝুলানো আইডি কার্ড প্রত্যেক হাজীকে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, হজ্জের সব আনুষ্ঠানিকতা এই মু'আল্লিমের অধীনেই সম্পন্ন হবে। মক্কা, মদীনা, মিনা, আরাফা, মুযদালিফা সব স্থানে যাতায়াতও মু'আল্লিম নম্বর সংবলিত স্টিকার লাগানো গাড়ীতেই করতে হবে। অবশেষে আরো প্রায় দেড়/দুই ঘণ্টা সফর শেষে পবিত্র ভূমি মক্কায় পৌঁছবে গাড়ী। স্ব স্ব হোটেলে পৌঁছে দেওয়া হবে সকলকে।

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন, নিজ বাড়ী থেকে এই পর্যন্ত মোট কত ঘণ্টার/দিনের সফর হল। হিসাব করলে চোখ ছানাবড়া। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এই দীর্ঘ সফরেও হাজী ছাহেবরা খুব একটা ক্লান্ত হননা। মহান আল্লাহ্‌র ঘর দর্শনের তীব্র বাসনা তাদেরকে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। ছবরের প্রথম ধাপে তারা উত্তীর্ণ হন।

ওমরাহ পালন : মক্কায় পৌঁছে হালকা বিশ্রাম ও খানাপিনার পর প্রথম কাজ হ'ল ওমরাহ পালন। এখানেও দিতে হবে ছবরের পরীক্ষা। হোটেল থেকে তালবিয়া পাঠ করতে করতে হারাম অভিমুখে যাত্রা করবে। সেখানে গিয়ে প্রথমে তাওয়াফ ও পরে সাঈ করবে। অর্থাৎ কা'বা ঘরের চারিদিকে সাত চক্কর দিবে এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাতবার দৌড়াবে। তাওয়াফ সাঈ করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিবে না। কাউকে ঠেলে সামনে যাবে না। সমস্বরে উচ্চশব্দে দো'আ পাঠ করে অন্যের ভাবগাম্ভীর্য তাওয়াফ ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। যেমনটি অনেককে করতে দেখা যায়। বিশেষ করে বিদেশী অনেক কাফেলাকে দেখা যায় তারা দল বেঁধে এভাবে দো'আ করেন। তাদের সাথে থাকা গাইড বা অন্যকোন হাজী উচ্চস্বরে দো'আ বলেন এবং তার সাথে সাথে সকলে সমস্বরে উক্ত দো'আ উচ্চারণ করেন। একই চিত্র ছাফা-মারওয়া সাঈর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এতে করে অন্যান্য হাজীদের একাগ্রতা ও আবেগময় প্রার্থনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। যা অনুচিত। এ অবস্থায় করণীয় হচ্ছে এই দল থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাওয়া এবং নিরিবিলি জায়গা দিয়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করা। কিন্তু কোনভাবেই তাদের উপরে বিরক্ত হয়ে কিছু বলা বা গালি দেওয়া যাবে না। বরং ছবর অবলম্বন করে চলতে হবে।

হজ্জের পাঁচ দিন

প্রথম দিন : মিনায় গমন

ওমরাহ সম্পন্নের পর হজ্জ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আর কোন আনুষ্ঠানিকতা নেই। শুধুমাত্র হারামে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ও যিয়ারা বা দর্শনীয় স্থান সমূহ পরিদর্শন। বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহ। উল্লেখ্য যে, অনেকে বাসা একটু দূরের অজুহাতে হারামে ছালাত আদায় না করে হোটেলেই ছালাত আদায় করেন। এতে তিনি প্রত্যেক ওয়াক্তে এক লক্ষ গুণ নেকী থেকে বঞ্চিত হন। অতঃপর হজ্জের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে ৮ই যিলহজ্জ থেকে। এ দিন মিনায় অবস্থান করতে হবে পরদিন ৯ই যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে। মিনায় গমনের জন্য বাংলাদেশী হাজীদের গাইড মু'আল্লিম অফিসে যোগাযোগ করে গাড়ী ও সময় ঠিক করবেন। দেখা যাবে নির্ধারিত সময়ের বহু পরে গাড়ী আসবে। এ ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়ত হোটেলে বা রাস্তায় অপেক্ষা করতে হয়। ধরুন রাত ১০-টায় গাড়ী আসবে বলা হ'ল। হাজীরাও প্রস্তুত। কিন্তু গাড়ী আসল রাত ২-টায়। মিনায় পৌঁছতে রাত চারটা। সেখানে গিয়ে দেখা গেল তাঁবু পাহাড়ের উপরে বা বাস থেকে নেমে অনেকখানি হাঁটতে হচ্ছে। তাঁবু পেয়েও দেখা গেল ভিতরে ঠাঁসা লোক, গায়ের সাথে গা লাগানো তোষক। এ সব বিলম্ব বা অপেক্ষা ও ব্যবস্থাপনার জন্য হাজীগণ চোখ বন্ধ করে গাইডকে দোষারোপ করেন, গালমন্দ করেন ও গাইডের যোগ্যতা ও আমানতদারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অথচ এগুলো সব সঊদী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে হয়।

২য় দিন : আরাফা ময়দানে অবস্থান

হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হচ্ছে আরাফার দিন। এ দিনে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে অধিক সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করে দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিন আল্লাহ রাববুল আলামীন তাঁর বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন, তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দারা আমার কাছে কি চায়'? *(মুসলিম হা/১৩৪৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ

دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ‘সবচেয়ে উত্তম দো‘আ হ’ল আরাফাহ দিবসের দো‘আ’।[৯]

মিনা থেকে আরাফার ময়দানে যাওয়ার সময়ও অনেক বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এখানেও গাড়ীর অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ৯ যিলহজ্জ সকালে আরাফার ময়দানে যাওয়ার কথা থাকলেও অতিরিক্ত হাজীর কারণে আগের রাত থেকে মু‘আল্লিম অফিসের গাড়ীগুলো হাজীদের নিতে শুরু করে। তারপরও সকাল গড়িয়ে যায় হাজী নেওয়া শেষ করতে। এখানেও ছবরের পরীক্ষা দিতে হয়।

মুযদালিফায় রাত্রীযাপন : আরাফা ময়দানে দিনব্যাপী তাসবীহ-তাহলীল যিকর-আযকার তওবা-ইস্তিগফার শেষে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের ছালাত আদায় না করে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে হয়। এই সময়টা আরো বেশী কঠিন। একারণে যে, সকল হাজী একসঙ্গে আরাফা থেকে বের হন। এখানেও গাড়ী বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। অনেকে পায়ে হেঁটে মুযদালিফায় গমন করেন। সেটাও অনেক কঠিন। কারণ আরাফা থেকে মুযদালিফার দূরত্ব প্রায় ১৪ কিলোমিটার। বাংলাদেশী বয়স্ক হাজীদের পক্ষে যা সম্ভব নয়। ফলে গাড়ীর পেতে পেতে অনেক সময় রাত ১০/১১টাও বেজে যায়। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে মুযদালিফা সীমা পর্যন্ত গাড়ী পৌঁছতে পারেনা। ফলে সেখানেও ২-৩ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়।

তৃতীয় দিন : জামরায় কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ও তাওয়াফে ইফাযা

মুযদালিফায় খোলা আকাশের নীচে রাত্রী যাপন শেষে হজ্জের তৃতীয় দিন ১০ই যিলহজ্জ ফজর ছালাতের পর সূর্যোদয়ের আগেই পায়ে হেঁটে মিনায় বড় জামরায় পাথর মারার জন্য রওয়ানা হ’তে হবে। এদিনে হজ্জের অনেকগুলো আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। পাথর মারা, কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডানো ও তাওয়াফে ইফাযা করা ইত্যাদি। ছবরের পরীক্ষা যেন প্রতিনিয়ত কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। এ দিন নিজেকে এতটাই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মনে হবে যেন শরীর আর চলছে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড় ঠেলে জামরায় পাথর মারতে হবে। গরমের দিনে তৃষ্ণায় যেন কলিজা শুকিয়ে যাবে। সেখান থেকে মাথা মুণ্ডিয়ে যাদের সামর্থ্যে কুলাবে তারা কুরবানী করতে যাবেন, অতঃপর মক্কায় গিয়ে ‘তাওয়াফে ইফাযা’ করবেন। সম্ভব না হ’লে ১২ তারিখ মিনা থেকে একবারে মক্কায় ফিরে ‘তাওয়াফে ইফাযা’ করবেন। কুরবানী ব্যাংকে টাকা দেওয়ার মাধ্যমে সঊদী সরকারের যিম্মায় দিয়ে দিবেন। ১০ যিলহজ্জ অতিক্রান্ত হ’লে নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হবে।

চতুর্থ দিন : মিনায় অবস্থান ও কংকর নিক্ষেপ

এ দিনের আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে মিনায় অবস্থান করা ও তিন জামরায় ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করা। পুনরায় মিনার তাঁবুতে গিয়ে অবস্থান করা।

পঞ্চম দিন : কংকর নিক্ষেপ ও মক্কায় প্রত্যাবর্তন

এ দিনে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে হাজীগণ মক্কায় ফিরে আসবেন। ১০ তারিখে যারা তাওয়াফে ইফাযা করতে পারেননি তারা মক্কায় ফিরে তাওয়াফে ইফাযা করে নিবেন। এভাবে একটি কষ্টকর ইবাদত পবিত্র হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ।

মদীনায় আট দিন ও দেশে প্রত্যাবর্তন : হজ্জ সফরের এক পর্যায়ে হজ্জের আগে বা পরে হাজীগণ মদীনা যাবেন ও সেখানে আট দিন অবস্থান করবেন। মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করবেন। রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর কবর এবং বাক্বীউল গারক্বাদ যিয়ারত করবেন। পরিদর্শন করবেন রাসূল (ছাঃ)-এর সংগ্রামী মাদানী জীবনের দর্শনীয় স্থান সমূহ। অতঃপর ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী জেদ্দা বা মদীনা থেকে বিমানে চড়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

ধৈর্যচ্যুতির ক্ষেত্রগুলো : প্রিয় পাঠক! হজ্জের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা আলোচ্য নিবন্ধে তুলে ধরেছি। মূলত হজ্জ একটি কঠিন ধৈর্যের ইবাদত। প্রতিটি ধাপেই ধৈর্যের প্রয়োজন। তারপরও আমরা দেখেছি পান থেকে চুন খসতেই দেশীয় গাইড বা কাফেলার মালিকের সাথে হাজী ছাহেবদের মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ, গালাগালি ইত্যাদি যেন লেগেই থাকে। একাধিকবার এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদেরকে মীমাংসা বৈঠকেও বসতে হয়েছে। হোটেলের সীট ভাল না, খাবার ভাল না, এসি ভালভাবে সার্ভিস দেয় না, লিফট মাঝেমধ্যেই নষ্ট থাকে, দূরত্ব এত বেশী কেন? এমনটিতো কথা ছিল না, আমরা কি টাকা দিয়ে হজ্জ করতে আসিনি। অমুকের বেটাকে দেশে গিয়ে মজা দেখাব ইত্যাদি অভিযোগ ও পরিভাষাগুলো বাংলাদেশী হাজীদের ও গাইডের ক্ষেত্রে অতি পরিচিত পরিভাষা। যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

অথচ এই আমরাই দেশে অনেক কষ্ট করে দিন যাপন করি। কারো বাসায় হয়তো এসি নেই এমনকি আইপিএসও নেই। তিনবেলা মাছ-গোশত খাইনা, লিফট ব্যবহার করে না। কিন্তু সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলা ওঠতে লিফট নষ্ট থাকলে আমাদের আর ছবর থাকে না। একইভাবে গাইডদেরও অনেকে হজ্জটাকে এতটাই ব্যবসায়িক করে নিয়েছেন যে, সঊদী আরব যাওয়ার পর তারা ওয়াদার কথা বেমালুম ভুলে যান। কাজেই তাদেরও এমন কিছু বলা উচিত না যা তারা করতে পারবেন না।

শেষ কথা : হজ্জ ইসলামের অন্যতম রুকন। হজ্জের মাধ্যমে আমরা সদ্যজাত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় দেশে ফিরে আসার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হ’তে পারি। কিন্তু যদি আমরা ছবরের পরীক্ষায় হেরে যাই তবে কি এটি অর্জন সম্ভব? আদৌ নয়। সেকারণ অবশ্যই আমাদেরকে ছবর বা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’তে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হজ্জ ‘মাবরূর’ হৌক, হজ্জের পুরো সময়টা মহান রবের ইবাদতে ব্যয়িত হৌক এটিই কাম্য হ’তে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!!

৯. *তিরমিযী হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/২৫৯৮, সনদ ছহীহ।*

রিয়া : কারণ ও প্রতিকার

-ড. নূরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮. আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করা :

রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যুকে স্মরণ করার পাশাপাশি আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার লাগাম টেনে ধরতে হবে। অল্পতে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করতে হবে। কারণ মানুষের চাহিদার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী- আদম সন্তানকে যদি দুই ময়দান ভর্তি সম্পদ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে আরেক ময়দান সমপরিমাণ সম্পদ চাইবে।[১] মূলত দু'টি কারণে মানুষ দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। ১. দুনিয়াপ্রেম ও ২. অজ্ঞতা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِى اثْنَتَيْنِ فِى حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَلِ 'মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হ'লেও দু'টি বিষয়ে তার হৃদয় তরুণই থেকে যায়- দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা বা মোহ এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা'।[২] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ، وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا 'দুই শ্রেণীর লোক তৃপ্ত হয় না; জ্ঞানলোভী ও দুনিয়ালোভী'।[৩]

দুনিয়াপ্রেমে আসক্ত হ'লে মানুষের জন্য দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরকে মৃত্যুর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে। অথচ মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমেই কেবল অন্তরকে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। আর অজ্ঞতার ফলে মানুষ মনে করে যে, সে সদা সর্বদা যুবক থাকবে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, যদি তাদের এই ভাবনাই সঠিক হত তাহলে শহরে-নগরে ও গ্রামে-গঞ্জে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের তুলনায় যুবকদের সংখ্যা কম কেন? তাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হ'ল, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই বহু মানুষ পরপারে চলে গেছে। এমনকি দেখা যায় একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হতে হতে হাযারো শিশু ও যুবকের মৃত্যু হয়ে যায়। কখনো মানুষ তার সুস্থতা দ্বারা প্রতারিত হয়। সে কল্পনাও করতে পারে না যে, হঠাৎ তার মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে যেতে পারে। এজন্যই ইবনু কুদামা মাকদেসী (রহঃ) বলেছেন, وَلَوْ تَفَكَّرَ وَعَلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ، مِنْ صَيْفٍ وَشِتَاءٍ وَرَبِيعٍ وَخَرِيفٍ وَلَيْلٍ وَنَهَارٍ، وَلَا هُوَ مُقَيَّدٌ بِسِنٍّ مَخْصُوصٍ، مِنْ شَابٍّ وَشَيْخٍ أَوْ كَهْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَعَظُمَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَاسْتَعَدَّ لِلْمَوْتِ 'যদি মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করে এবং উপলব্ধি করে যে, মৃত্যু কোন নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়- না গ্রীষ্ম, না শীত, না বসন্ত, না শরৎ, না রাত, না দিন। তেমনি এটি কোন নির্দিষ্ট বয়সের সাথেও সীমাবদ্ধ নয়- না যুবক, না বৃদ্ধ, না মধ্যবয়স্ক বা অন্য কেউ। তবে তার কাছে মৃত্যুর বিষয়টি গুরুতর ও ভয়াবহ মনে হবে এবং সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে'।[৪]

তাবেঈ আবু ওছমান আন-নাহদী বলেন, بَلَغْتُ ثَلَاثِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَدْ عَرَفْتُ فِيهِ النُّقْصَانَ إِلَّا أَمَلِي فَإِنَّهُ كَمَا هُوَ. 'আমি একশ ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছি। জীবনের প্রায় সবকিছুর মধ্যেই ক্ষয় ও হ্রাস লক্ষ্য করেছি- শুধু আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া। তা আজও আগের মতোই অটুট ও চিরযৌবনা রয়ে গেছে'।[৫]

মুহাম্মাদ বিন আবু তাওবা (৪৫৫-৫৩৫হি.) বলেন, মা'রূফ আল-কারখী ছালাতের একামত দিয়ে আমাকে ইমামতি করতে বললেন। আমি বললাম, ঠিক আছে, শুধু এই ছালাতের জন্যই আমি তোমাদের ইমাম হব। কিন্তু এরপরে আর আমি তোমাদের ইমাম হতে পারব না। তখন কারখী তাকে বললেন, 'তুমি মনে করছ যে, অন্য কোন ছালাতে তুমি ইমাম হওয়ার সুযোগ পাবে? বেঁচে থাকার এই দীর্ঘ আশা পোষণ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। এই আশা-আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে উত্তম আমল করতে বাধা দেয়'।

বেঁচে থাকার আশা এমনই কম ছিল দুনিয়াবিমুখ বান্দাদের। যতই এই আশার পরিমাণ অল্প হয়, ততই আমল হয় সুন্দর। কারণ যাদের আশা কম তারা মনে করে, আজই হয়তো মারা যাব। তারা সদা মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যদি কোনভাবে দিনটা পার হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন তারা তাদেরকে নিরাপদে রাখার জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে এবং মনে করে, এই রাতেই তারা মৃত্যুবরণ করতে পারে। একথা ভেবে তারা পুনরায় আমলের প্রতি মনোনিবেশ করে।[৬]

৯. মন্দ সমাপ্তির ভয় :

মন্দ সমাপ্তির ভয় করা। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ 'নিশ্চয়ই মানুষের আমলের প্রকৃত মূল্যায়ন তার শেষ পরিণতির উপরই নির্ভরশীল'।[৭] সুতরাং মুমিন বান্দা সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, যদি তার জীবনের শেষ আমল রিয়া বা লৌকিকতাপূর্ণ হয় তাহ'লে সে পরকালে বিশাল ক্ষতি ও মহাবিপদের সম্মুখীন হবে। কেননা মানুষ যেভাবে মৃত্যুবরণ করবে ক্বিয়ামতের দিন তাকে সেভাবেই উত্থিত করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ 'মানুষকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে'।[৮] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ

১. *মুত্তাফাক আলাইহ; মিশকাত হা/৫৭২৭, 'আশা ও লোভ অনুচ্ছেদ'।*
২. *মুত্তাফাক আলাইহ; মিশকাত হা/৫২৭১।*
৩. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯৭৯৮; মিশকাত হা/২৬০; ছহীহুল জামে হা/৬৬২৪।*
৪. *ইবনু কুদামা মাকদেসী, মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ৩৮৬।*
৫. *তদেব।*
৬. *তদেব।*
৭. *বুখারী হা/ ৬৬০৭।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪২২৯, হাদীছ ছহীহ।*

عَلَيْهِ ‘প্রত্যেক মানুষকে ক্বিয়ামতের দিন সেই অবস্থাতেই উত্থিত করা হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছিল’।[৯] অতএব উত্তম আমলের মাধ্যমে যেন জীবনাবসান ঘটে সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে এজন্য তাওফীক কামনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ‘আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে (সৎকর্মে) নিয়োজিত করেন। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে তাকে নিয়োজিত করেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎকাজ করার তাওফীক দান করেন’।[১০]

১০. নিজেকে আল্লাহ্র দাস ভাবা :

একজন মুমিন-মুসলিম ব্যক্তি সর্বদা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, সে আল্লাহ্র শুধুই একজন দাস। যেহেতু আসমান ও যমীনের সবকিছুই আল্লাহ্র দাস *(মারিয়াম ১৯/৯৩)*। নবী, রাসূল এবং ফেরেশতাগণ সবাই আল্লাহ্র দাসত্ব করেন। তাদের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন মাজীদে ‘আবদ’ বা ‘ইবাদ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে *(বনী ইসরাঈল ৩, ছোয়াদ ১৭, বাক্বারাহ ২৩, আম্বিয়া ২১ প্রভৃতি)*। শায়খ ড. ছালেহ ফাওযান বলেন, وَمَقَامُ الْعُبُودِيَّةِ هُوَ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ، وَلَا شَيْءَ أَشْرَفُ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‘আল্লাহ্র প্রতি দাসত্বের মর্যাদাই সর্বোচ্চ মর্যাদা। মহান আল্লাহ্র জন্য দাসত্বের চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান আর কিছুই নেই’।[১১]

মালিকের সেবার কারণে দাস কোন বিনিময় বা প্রতিদানের হকদার হতে পারে না। কেননা সে মনিবের সেবা করে তার দাসত্বের দাবি পূরণের জন্য। মনিবের নিকট থেকে সে যে প্রতিদান পায়, তা স্রেফ অনুগ্রহ ও দয়া, কোন বিনিময় নয়।

১১. আল্লাহ্র করুণা ও অনুগ্রহ অনুধাবন করা :

বান্দার প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ গণনা করে শেষ করা যাবে না *(নাহল ১৬/১৮)*। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হ’ল, তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ, দয়া ও তাওফীক প্রত্যক্ষ ও পর্যালোচনা করা। সেই সাথে এটি অনুধাবন করা যে, এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, এতে তার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ্র ইচ্ছা-ই তার আমলটির অস্তিত্বকে আবশ্যক করেছে, নিজের ইচ্ছা নয়। তাই প্রত্যেকটি কল্যাণ একমাত্র আল্লাহ্র করুণা ও অনুগ্রহ বৈ কিছুই নয়।[১২]

১২. নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনা করা :

নিজের আমলে বিদ্যমান ত্রুটি, শৈথিল্য ও অসম্পূর্ণতা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। আমলে বিদ্যমান প্রবৃত্তি ও শয়তানের ভাগ প্রত্যক্ষ করা। প্রতিটি আমলেই স্বল্প পরিমাণ হলেও শয়তানের অংশ থাকে এবং প্রবৃত্তির কিছু ভাগ থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের মধ্যে মুছল্লীর এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ ‘এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার ছালাত হ’তে অংশবিশেষ নিঃশব্দে ছিনিয়ে নেয়’।[১৩]

ছালাতে এক পলক দৃষ্টিপাতের যদি এই অবস্থা হয় তাহ’লে গায়রুল্লাহর দিকে মন চলে যাওয়ার কি হিসাব হবে!

১৩. শয়তান তাড়ানোর উপায় জানা :

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু *(বাক্বারাহ ২/১৬৮ ও ২০৮)*। সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে এবং কুমন্ত্রণা দিতে সদা তৎপর ও প্রস্তুত থাকে। হাসান বাছরী (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইবলীস কি ঘুমায়? তিনি বললেন, لَوْ نَامَ لَوَجَدْنَا رَاحَةً ‘সে ঘুমালে তো আমরা আরাম পেতাম’।[১৪]

শয়তান রিয়ার উৎস ও সকল বিপদের মূল হোতা। সে মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহের মতো প্রবাহিত হয়।[১৫] শয়তান মানুষের জীবনের প্রায় সব বিষয়ে উপস্থিত থাকে। শয়তান তার দুর্গ ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার জন্য নিজের বাহিনী পাঠায় এবং আরোহী ও পদাতক বাহিনী নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে তাকে নানা মিথ্যা আশা ও প্রতিশ্রুতি দেয়। অথচ শয়তানের প্রতিশ্রুতি কেবল প্রতারণা ও ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সে মানুষের কাছে মন্দ কাজকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে। রিয়া থেকে বাঁচার জন্য এই বাস্তবতা সর্বদা একজন মুসলিমকে স্মরণ রাখতে হবে। সেই সাথে শয়তান তাড়ানোর উপায়গুলোও জানতে হবে।

বিভিন্ন বিষয় থেকে শয়তান পলায়ন করে। যেমন, আযান, কুরআন তেলাওয়াত, তেলাওয়াতের সিজদা, আউযুবিল্লাহ পাঠ করলে, বাড়ি থেকে বের হওয়ার দো‘আ পড়লে, সূরা নাস ও ফালাক পড়লে প্রভৃতি।[১৬]

১৪. রিয়াকে ভয় করা :

দুনিয়া অর্জনের জন্য আমল করা এবং আমল ধ্বংসকারী সর্বগ্রাসী রিয়াকে ভয় করতে হবে। কারণ কোন ব্যক্তি কোন বিষয়কে ভয় পেলে সেই বিষয় থেকে সতর্ক থাকতে সচেষ্ট হয়। ফলে সে তা থেকে মুক্তি পায়। তাই মানুষের কর্তব্য হ’ল, যখন অন্তর প্রশংসাবারি ও গুণকীর্তনের বিপদের প্রতি আগ্রহী ও ব্যাকুল হয়ে উঠবে, তখন নিজের আত্মাকে রিয়ার বিপদসমূহ এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। সুতরাং প্রশংসা শোনার আগ্রহকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিকে অপছন্দের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে। কারণ মানুষ দেখছে এই কথা জানলে অন্তরে খ্যাতি ও

---

৯. মুসলিম হা/২৮৭৮।
১০. তিরমিযী হা/২১৪২, হাসান ছহীহ।
১১. ড. ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান, আত-তা‘লীকাতুল মুখতাছারাহ আলা মাতনিল আক্বীদা আত-তহাবিয়াহ (কায়রো: দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি.), পৃ. ৪৮।।
১২. আব্দুল মালেক আল-কাসেম, মিফতাহু দাওয়াতির রুসুল, পৃ. ৮৩।
১৩. বুখারী হা/৭৫১।
১৪. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ৩৬।
১৫. তিরমিযী হা/১১৭২।
১৬. সালীম-আল হেলালী, আর-রিয়া, পৃ. ৬৪-৬৫।

প্রশংসার লালসা জাগে। আর রিয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হলে তার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মে।[১৭]

১৫. আল্লাহ্‌র নিন্দা থেকে পলায়ন করা :

আল্লাহ্‌র নিন্দা থেকে পলায়ন করা। কেননা রিয়ার একটি কারণ হ'ল, মানুষের নিন্দা থেকে পলায়ন করা। কিন্তু জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি জানে, আল্লাহ্‌র নিন্দা থেকে পলায়ন করাই উত্তম। কেননা আল্লাহ্‌র নিন্দা হ'ল অসম্মান। যেমন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার প্রশংসা মানুষের জন্য সম্মান ও সৌন্দর্যের কারণ এবং আমার নিন্দা হ'ল অপমান। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, এ মর্যাদা কেবল আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য'।[১৮]

অর্থাৎ মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা দ্বারা কারো প্রকৃত মর্যাদা নিরূপিত হয় না। প্রকৃত সম্মান, মর্যাদা ও অপমানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। নিঃসন্দেহে যখন কোন বান্দা মানুষকে ভয় করে তখন সে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে খুশি করতে চায়। ফলে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং মানুষদেরকেও তার উপর ক্রুদ্ধ করে তোলেন। সুতরাং আমরা কি মানুষের ক্রোধকে ভয় করব, না আল্লাহ্‌র ক্রোধকে? সত্যিকার অর্থে আল্লাহই ভয় করার অধিক উপযুক্ত।[১৯]

১৬. মানুষের নিন্দা ও প্রশংসার তোয়াক্কা না করা :

মানুষের নিন্দা ও প্রশংসার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ না করা। কেননা তা কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। বরং আল্লাহ্‌র নিন্দাকে ভয় করতে হবে এবং তার অনুগ্রহ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 'তুমি বলে দাও, 'এ হল তাঁরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম' *(ইউনুস ১০/৫৮)*।

মানুষ আপনার কোন গুণের প্রশংসা করলে আপনি ভেবে দেখবেন যে, আপনার মধ্যে সেই গুণটি বিদ্যমান আছে কি-না ? যদি থাকে এবং তা আনন্দিত হওয়ার মতো বিষয় হয় যেমন ইলম ও তাক্বওয়া। তাহ'লে তার শেষ পরিণতি কি হবে তা নিয়ে চিন্তিত থাকুন! কেননা শেষ পরিণতির ভয় প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার থেকে দূরে রাখবে। সুন্দর পরিসমাপ্তির আশায় আনন্দিত হলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত হতে হবে; মানুষের প্রশংসার কারণে নয়। আর যদি এমন বিষয়ে আপনার প্রশংসা করা হয়- যা আনন্দিত হওয়ার মতো নয় যেমন মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ তাহ'লে জেনে রাখুন যে, এই ধরনের প্রশংসায় আনন্দ করা ঠিক সেই আনন্দের মতো, যেমন পৃথিবীর উদ্ভিদে আনন্দ করা যা অচিরেই শুকিয়ে ক্ষয় ও ধ্বংস হয়ে যায়। এ ধরনের বিষয়ে কেবল সেই ব্যক্তিই আনন্দিত হয় যার বুদ্ধি কম! আর আপনি যদি সেই গুণ থেকে শূন্য হ'ন যার কারণে আপনার প্রশংসা করা হয়েছে তবে সে প্রশংসায় আপনার আনন্দ করা চরম পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আপনার নিন্দা করে সে হয়তো আপনাকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তা বলে। সেক্ষেত্রে তার এই অনুগ্রহ স্বীকার করা উচিত এবং রাগ করা ঠিক নয়। কারণ সে আপনার দোষ-ত্রুটিগুলো আপনার কাছে তুলে ধরেছে। আর যদি সে উপদেশের উদ্দেশ্যে না বলে থাকে তবে সে নিজের দ্বীনেরই ক্ষতি করেছে; অথচ আপনি তার কথার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। কারণ আপনাকে এমন কিছু ত্রুটি সম্পর্কে সে অবগত করেছে, যা আপনি আগে জানতেন না এবং আপনার ভুলগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যেগুলো আপনি ভুলে গিয়েছিলেন।

আর যদি সে আপনার বিরুদ্ধে এমন অপবাদ দেয় যার থেকে আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ তবে আপনার ৩টি বিষয় নিয়ে চিন্তা করা উচিত :

১. যদি আপনি এই দোষ থেকে মুক্ত হন তবু এর মত আরও বহু দোষ থেকে মুক্ত নন। আল্লাহ তা'আলা আপনার যে অসংখ্য দোষ গোপন রেখেছেন তা অনেক বেশি। তাই আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করুন যে, তিনি আপনার দোষগুলো প্রকাশ করেননি এবং মানুষের সামনে তা তুলে ধরেননি। বরং এমন একটি দোষের কথা বলা হয়েছে যেটি থেকে আপনি মুক্ত।

২. এই ধরনের অপবাদ ও নিন্দা আপনার গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়।

৩. সে নিজের দ্বীনের উপর অন্যায় করেছে এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের সম্মুখীন হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا 'যে কেউ কোন দোষ বা পাপ করে, অতঃপর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে' *(নিসা ৪/১১২)*। তাই তার উচিত আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।[২০] কেননা আল্লাহ বলেন, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়' *(নূর ২৪/২২)*।

১৭. মানুষের নিকট যা আছে তার প্রতি লোভ না করা :

মানুষের নিকট যা কিছু রয়েছে তার প্রতি লোভাতুর না হওয়া। অন্যের মালিকাধীন সম্পদের লালসা দূর করার জন্য

১৭. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২৩; সালিম আল-হেলালী, আর-রিয়া, পৃ. ৬৩-৬৪।*
১৮. *তিরমিযী হা/৩২৬৭, হাদীছ ছহীহ।*
১৯. *নূরুল ইখলাছ, পৃ. ৫১১।*
২০. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২১২-২১৩।*

জানতে হবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল অন্তরের নিয়ন্ত্রক। তিনি দান করা ও নিষেধ করার মাধ্যমে অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনি ব্যতীত রিযিকদাতা কেউ নেই। যে ব্যক্তি বান্দার সম্পদের প্রতি লালসা রাখে সে লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। যদি সে এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হাছিল করে নেয় তবুও সে অপমান এবং খোঁটার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। তাই মিথ্যা আশা এবং ভ্রান্ত চিন্তার ফাঁদে পড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে যে প্রতিদান আছে তা হাতছাড়া করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?[২১]

১৮. পরকালের নে'মত ও শাস্তি সম্পর্কে জানা :

আল্লাহ তা'আলা পরকালে বান্দার জন্য যে অফুরন্ত নে'মতের ভাণ্ডার জান্নাত ও কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন, এই বিষয়গুলো যখন বান্দা অবগত হবে তখন সে রিয়া পরিত্যাগ করে ইখলাছের দিকে ধাবিত হবে।

১৯. ইখলাছের ফলাফল সম্পর্কে জানা :

ইখলাছের ফলাফল, উপকারিতা এবং ইহকাল ও পরকালে তার প্রশংসনীয় পরিণাম সম্পর্কে জানা। কারণ ইখলাছ হ'ল সকল ইবাদতের সার ও প্রাণ। নফসের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হল ইখলাছ অবলম্বন করা। এজন্য বলা হয়েছে, مَنْ سَلِمَ لَهُ مِنْ عُمُرِهِ لَحْظَةٌ وَاحِدَةٌ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، نَجَا 'যার জীবনের একটি মুহূর্তও একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অতিবাহিত হয়েছে, সে মুক্তি লাভ করবে'।[২২]

ইখলাছের কিছু ফায়েদা ও ফলাফল হ'ল, আল্লাহর নিকট আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হ'ল ইখলাছ।[২৩] ইখলাছ গুনাহ মাফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। ইখলাছের মাধ্যমে শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। কুমন্ত্রণা ও লৌকিকতা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। ফিতনা-ফাসাদ ও বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ইখলাছ জাতির বিজয়ের মূলমন্ত্র। ইখলাছের কারণে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চমর্যাদা লাভ করা যায়। ইখলাছের মাধ্যমে প্রশান্তি, সুখানুভূতি এবং ভালো কাজ করার তাওফীক অর্জিত হয় প্রভৃতি।

২০. রিয়ার আশঙ্কায় আমল পরিত্যাগ না করা :

অনেক মানুষ রিয়া বা লৌকিকতায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আমল করা ছেড়ে দেয়। অথচ আমল ছেড়ে দেওয়া কস্মিনকালেও রিয়া থেকে বাঁচার চিকিৎসা হ'তে পারে না। বরং বেশী বেশী আমলের পাশাপাশি নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা এবং মানুষের চিন্তা বাদ দিয়ে অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির ভাবনাকে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে রিয়া থেকে বাঁচা সম্ভব।

যখনই আপনার মনে এই চিন্তা উঁকি মারবে যে, মানুষের সামনে আমি আমল করব না। কেননা এতে আমার মাঝে লৌকিকতা চলে আসতে পারে, সাথে সাথে মনকে বলুন, তুমি কোনটিকে প্রাধান্য দিবে? মানুষের দেখাকে, নাকি আল্লাহর দেখাকে? ইব্রাহীম নাখঈ বলেন, إِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ فِيْ صَلَاةٌ فَقَالَ إِنَّكَ مُرَاءٍ فَزِدْهَا طُولًا 'তুমি ছালাতরত অবস্থায় শয়তান যদি তোমাকে এসে বলে, তুমি লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করছো। তখন তুমি তোমার ছালাতকে লম্বা করে পড়'।[২৪]

২১. আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা :

সৎ আমল বিধ্বংসী নিরব ঘাতক রিয়া থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। কারণ তাঁর সাহায্য ব্যতীত এই ঘাতক হৃদব্যাধি থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। শায়খ আব্দুর রহমান সা'দী বলেন, الرِّيَاءُ آفَةٌ عَظِيمَةٌ، وَيَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجٍ شَدِيدٍ، وَتَمْرِينِ النَّفْسِ عَلَى الْإِخْلَاصِ، وَمُجَاهَدَتِهَا فِي مُدَافَعَةِ خَوَاطِرِ الرِّيَاءِ وَالْأَغْرَاضِ الضَّارَّةِ، وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ عَلَى دَفْعِهَا، لَعَلَّ اللهَ يُخْلِصُ إِيمَانَ الْعَبْدِ وَيُحَقِّقُ تَوْحِيدَهُ. 'রিয়া এক ভয়াবহ ব্যাধি। এর কঠিন চিকিৎসা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন নিজের নফসকে ইখলাছের উপর প্রশিক্ষিত করা। রিয়ার কুমন্ত্রণা ও ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে নিরন্তর আত্মসংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং সেগুলো প্রতিহত করতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার ঈমানকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং তার তাওহীদকে পরিপূর্ণ করে দিবেন।'[২৫]

২২. দো'আ করা :

রিয়া থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করা এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে নবী (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেন, يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ 'হে আবুবকর! তোমাদের মধ্যে শিরক পিঁপীলিকার পদচারণা থেকেও অধিক গোপন ও অদৃশ্য। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, কারো আল্লাহর সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শিরক আছে? নবী (ছাঃ) বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিবো না, তুমি যা বললে শিরকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেন, তুমি বলো, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. 'হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা

২১. *তদেব, পৃ. ২২৩.*
২২. *তদেব, পৃ. ৩৩৬।*
২৩. *বাইয়িনাহ ৯৮/৫; নাসাঈ হা/ ৩১৪০, হাদীছ ছহীহ।*
২৪. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২৫।*
২৫. *শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী, আল-কাওলুস সাদীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ (রিয়াদ : দারুছ ছাবাত, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২২০।*

থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই'।[২৬]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন,يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ دَائِمًا 'সর্বদা এই দো'আ পাঠ করা মুসলমানের কর্তব্য'।[২৭]

পরিশেষে বলা যায়, রিয়া থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইতে হবে ও দো'আ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ 'অতএব তোমরা দ্রুত আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হ'তে স্পষ্ট সতর্ককারী' *(যারিয়াত ৫১/৫০)*। নিজেকে মুত্তাকী ও পরহেযগার ভেবে আত্মপ্রসাদে ভোগা যাবে না। ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনাদর্শে আমাদের জন্য এ বিষয়ে শিক্ষণীয় রয়েছে। তিনি শিরকে আকবর থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছিলেন, وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ 'আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫)*। তিনি নিজ হাতে মূর্তি ভাঙার পরেও মূর্তিপূজায় পতিত হওয়ার আশংকা করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের এ দুরারোগ্য মনোব্যাধি থেকে হেফাযত করুন! আমীন!!

২৬. *ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৫১।*
২৭. *https://surl.li/hksdpj*

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : মে-জুন ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ মে	১৩ যুলক্বা'দাহ	১৮ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:০৪	০৫:২৫	১১:৫৬	০৩:২২	০৬:২৮	০৭:৪৮
০৩ মে	১৫ যুলক্বা'দাহ	২০ বৈশাখ	রবিবার	০৪:০৩	০৫:২৩	১১:৫৬	০৩:২১	০৬:২৯	০৭:৪৯
০৫ মে	১৭ যুলক্বা'দাহ	২২ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:০১	০৫:২২	১১:৫৬	০৩:২১	০৬:৩০	০৭:৫১
০৭ মে	১৯ যুলক্বা'দাহ	২৪ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৩:৫৯	০৫:২১	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩১	০৭:৫২
০৯ মে	২১ যুলক্বা'দাহ	২৬ বৈশাখ	শনিবার	০৩:৫৭	০৫:২০	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩১	০৭:৫৩
১১ মে	২৩ যুলক্বা'দাহ	২৮ বৈশাখ	রবিবার	০৩:৫৬	০৫:১৯	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩২	০৭:৫৫
১৩ মে	২৫ যুলক্বা'দাহ	৩০ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৩:৫৪	০৫:১৭	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩৩	০৭:৫৬
১৫ মে	২৭ যুলক্বা'দাহ	০১ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৫৩	০৫:১৭	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৭:৫৭
১৭ মে	২৯ যুলক্বা'দাহ	০৩ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৫২	০৫:১৬	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৫	০৭:৫৯
১৯ মে	০১ যুলহিজ্জাহ	০৫ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৫১	০৫:১৫	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৬	০৮:০০
২১ মে	০৩ যুলহিজ্জাহ	০৭ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৯	০৫:১৪	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৭	০৮:০১
২৩ মে	০৫ যুলহিজ্জাহ	০৯ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৮	০৫:১৩	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৩
২৫ মে	০৭ যুলহিজ্জাহ	১১ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৮	০৫:১৩	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৪
২৭ মে	০৯ যুলহিজ্জাহ	১৩ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৭	০৫:১২	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৫
২৯ মে	১১ যুলহিজ্জাহ	১৫ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৬	০৫:১২	১১:৫৬	০৩:১৭	০৬:৪০	০৮:০৬
৩১ মে	১৩ যুলহিজ্জাহ	১৭ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:০৮
০১ জুন	১৪ যুলহিজ্জাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:০৮
০৩ জুন	১৬ যুলহিজ্জাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৫	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	১৮ যুলহিজ্জাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৭	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	২০ যুলহিজ্জাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৪	০৮:১১
০৯ জুন	২২ যুলহিজ্জাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৫	০৮:১২
১১ জুন	২৪ যুলহিজ্জাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৩
১৩ জুন	২৬ যুলহিজ্জাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৪
১৫ জুন	২৮ যুলহিজ্জাহ	০১ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৮	০৬:৪৭	০৮:১৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-২	-১	০	-১	০
গাযীপুর	০	০	+১	-১	+১
শরীয়তপুর	+২	০	-১	-১	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+৪
কিশোরগঞ্জ	০	-২	+০	০	+০
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৪	+৪	+৪	+৩	+৪
মাদারীপুর	+২	+১	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+১	+১	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	-২	+২	+৫	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	-৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	-১	+৩	+৬	+৪	+৬
নেত্রকোণা	-৪	-১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+২	+৪	+২
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+২	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৪	+৪	+৬	+৪
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৪	+৪
খুলনা	+৬	+৪	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৫	+৩	০	+১	০
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	-২	-১	-২
পটুয়াখালী	+৪	+১	-৩	-২	-৩
পিরোজপুর	+৫	+২	-১	০	-১
বরিশাল	+৩	০	-২	-১	-২
ভোলা	০	০	০	-৩	+১
বরগুনা	+৫	+১	-২	-১	-৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৬	+৫	+৬
বগুড়া	+১	+৪	+৭	+৬	+৮
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৫	+৯	+৮	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৯	+১১	+১০	+১২
নওগা	+৩	+৭	+১০	+৮	+১০

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	০	+৮	+১৪	+১২	+১৫
দিনাজপুর	+২	+৭	+১২	+১০	+১৩
লালমণিরহাট	-২	+৫	+১০	+৮	+১১
নীলফামারী	০	+৬	+১২	+১০	+১৩
গাইবান্ধা	০	+৪	+৭	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	+২	+৯	+১৪	+১২	+১৫
রংপুর	-১	+৫	+১০	+৮	+১১
কুড়িগ্রাম	-৩	+৩	+৮	+৭	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-২	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-২	-৪	-৫	-৫	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২	-২	-২
রাঙ্গামাটি	-৪	-৭	-৯	-৯	-১০
নোয়াখালী	০	-৩	-৫	-৪	-৫
চাঁদপুর	০	-১	-৩	-২	-৩
লক্ষ্মীপুর	০	-১	-৩	-৩	-৩
চট্টগ্রাম	-২	-৫	-৯	-৮	-৯
কক্সবাজার	০	-৬	-১২	-১০	-১২
খাগড়াছড়ি	-৫	-৮	-১০	-৭	-১০
বান্দরবান	-৩	-৭	-১২	-১০	-১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৯	-৬	-৩	-৪	-২
মৌলভীবাযার	-৮	-৫	-৪	-৪	-৩
হবিগঞ্জ	-৬	-৪	-২	-৩	-২
সুনামগঞ্জ	-৭	-৪	-১	-১	-১

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

যেমন ছিল সালাফদের হজ্জ-ওমরাহ

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

হজ্জ মুমিনের জন্য পাপমুক্তি ও আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের অনন্য মাধ্যম। বর্তমানে হজ্জের সফর আরামদায়ক ও যান্ত্রিক হ'লেও এতে পূর্বসূরী বা সালাফে ছালেহীনদের মতো ইখলাছ ও একনিষ্ঠতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সালাফগণ ইহরামের শুভ্রতার কাফনে এবং আরাফার ময়দানে ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা অনুভব করতেন। তাদের 'লাব্বাইক' ধ্বনি শুধু কণ্ঠ থেকে নয়; বরং হৃদয়ের গহীন থেকে উৎসারিত হ'ত। লৌকিকতামুক্ত সেই হজ্জ ছিল তাক্বওয়া, ধৈর্য ও বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। বর্তমানের বাহ্যিক আড়ম্বর ছেড়ে আমাদের হজ্জকে 'হজ্জে মাবরূর' বা কবুল হজ্জে পরিণত করতে সালাফদের সেই তাক্বওয়া ও আত্মিক সফরের আদর্শে ফিরে দেখা আজ একান্ত প্রয়োজন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সেই বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

১. হজ্জের প্রতি সালাফদের প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ :

সালাফে ছালেহীনের কাছে হজ্জ কোন আনুষ্ঠানিক সফর ছিল না; বরং তা ছিল পরম আগ্রহে আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দেওয়ার নিরন্তর কোশেশ। ব্যাকুল হৃদয়ে আল্লাহ্র পথে ছুটে চলার দুর্নিবার যাত্রা। সম্পদের মোহ, সংসারের মায়া আর শারীরিক ক্লান্তি- সবই হার মানত বায়তুল্লাহ দর্শনের তীব্র তৃষ্ণার কাছে। রবের দরবারে হাযিরা দেওয়ার এই সফরে তাদের ঈমানদীপ্ত আগ্রহ ও অপরিসীম ত্যাগ আমাদের জন্য ইবাদতের এক বিস্ময়কর মানদন্ড হয়ে আছে। হজ্জের এই বিপুল মর্যাদা ও প্রাপ্তি সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর একটি ঘটনা আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি একবার বের হয়ে একদল আরোহীকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কারা?' তারা বলল, 'আমরা হজ্জযাত্রী'। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হজ্জ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তোমাদের বের করেনি তো?' তারা বলল, 'না'। তখন তিনি বললেন, لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أَنَاخُوا لَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْفَضْلِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ 'এই আরোহীরা যদি জানত তারা কার দরবারে এসে উট নামিয়েছে, তবে ক্ষমা পাওয়ার পর আল্লাহ্র অনুগ্রহ দেখে তাদের চোখ জুড়িয়ে যেত'। তারপর তিনি বললেন, সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে ওমরের প্রাণ! একটি উট তার পা যখনই উপরে তোলে কিংবা নিচে রাখে, আল্লাহ তার বিনিময়ে আরোহীর একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, একটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং একটি নেকী লিখে দেন'।[১] জাবের ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, 'আমি নেক আমলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, ছালাত শরীরের শ্রম ঘটায় কিন্তু সম্পদের নয়; ছিয়ামও তদ্রূপ। কিন্তু হজ্জ সম্পদ এবং শরীর উভয়েরই শ্রম ঘটায়। তাই আমার নিকট হজ্জকে এসবের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয়'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ 'নিশ্চয়ই আমি আমার যে বান্দাকে শারীরিক সুস্থতা দান করেছি এবং জীবিকায় সচ্ছলতা দিয়েছি, তার ওপর দিয়ে যদি পাঁচটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ সে (হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে) আমার দরবারে উপস্থিত হয় না, তবে সে অবশ্যই বঞ্চিত'।[৩] এই হাদীছের মর্মকে সালাফগণ গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। প্রখ্যাত তাবেঈ আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ নাখঈ (রহঃ) হজ্জকে এত গুরুত্ব দিতেন যে, যদি শুনতে পেতেন কোন লোকের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে হজ্জ না করে মারা গিয়েছে, তাহ'লে তিনি তার জানাযা ছালাতে অংশগ্রহণ করতেন না।[৪] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'মানুষ মাঝে মাঝে তার রবের প্রতি তীব্র আগ্রহ অনুভব করে, সেই আগ্রহ পূরণের ক্ষেত্রে কোন এক মাধ্যমের প্রয়োজন বোধ করে। আর সেটা কেবল হজ্জই পূরণ করতে পারে।[৫] ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (রহঃ) বলেন, 'দুনিয়া কেবল একটা স্বপ্নের মত। আমি চব্বিশ বছর বয়সে হজ্জ করেছিলাম। হজ্জের জন্য হেঁটে বাগদাদ থেকে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম। এটা পঞ্চাশ বছর আগের কথা। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গতকালের ঘটনা।[৬]

তাবেঈ তাউস ইবনে কায়সান (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ফরয হজ্জ আদায়ের পর (নফল) হজ্জ করা উত্তম নাকি ছাদাক্বা করা উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, ইহরাম বাঁধা, সফর করা, নির্ঘুম রাত কাটানো, ক্লান্তি সহ্য করা, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা ও তার পাশে ছালাত আদায় করা, আরাফায় অবস্থান করা, মুযদালিফায় রাত কাটানো এবং জামারায় পাথর নিক্ষেপ করার মত ছাওয়াব আর কোথায় পাওয়া যাবে? অর্থাৎ তিনি হজ্জকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন'।[৭] আর এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাদ সালাফগণ একবার পেয়ে ক্ষান্ত হ'তেন না। বারবার ছুটে যেতেন মক্কার পানে। ইবনে শাওযাব (রহঃ) বলেন, 'আমি ১০৬ হিজরীতে মক্কায় তাউস (রহ.)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। আমি লোকজনকে বলতে শুনেছি– হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। তিনি চল্লিশবার হজ্জ সম্পন্ন করেছিলেন'।[৮] কেবল তাউস (রহঃ) নন, তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, আত্বা ইবনে আবী রাবাহ, আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী, মুহাম্মাদ বিন সূওক্বাহ, হাম্মাদ বিন

---

*. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

১. আব্দুর রাযযাক ছান'আনী, মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৫/২৩২।

২. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুস ছাফওয়া, ২/১৪০; হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/৮৭।

৩. মুসনাদে আবী ইয়া'লা মাওছীলী, হা/১০৩১; ছহীহাহ হা/১৬৬২; ছহীহুল জামে', হা/১৯০৯; সনদ ছহীহ।

৪. ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮/১৯৪।

৫. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/৪২।

৬. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ৬৭/২৪৩।

৭. আব্দুর রাযযাক ছান'আনী, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৫/২৩৬।

৮. আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল, ২/৪৬৩।

নাফে‘ (রহঃ)-এর মতো অসংখ্য সালাফ ৪০ বারেরও বেশী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ্র ঘরের প্রতি তাঁদের নিখাঁদ ভালোবাসা এবং অদম্য আগ্রহের নযীর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইবাদতের এক অনন্য অনুপ্রেরণা।

সালাফদের এই অভাবনীয় ত্যাগ ও মহব্বতের আয়নায় যখন নিজের দিকে তাকাই, তখন নিজেকে কত নগন্য মনে হয়। বর্তমানের সফর কতই না সহজ! শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিমান, বিলাসবহুল হোটেল আর আরামদায়ক বাহনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার সফরেই আমরা পৌঁছে যেতে পারি পবিত্র ভূমিতে। কিন্তু আধুনিকতার এই চরম উৎকর্ষের যুগে আমাদের সফরের কষ্ট হয়ত কমেছে, তবে এর সাথে সাথে কি আমার অন্তর থেকে সেই ইখলাছ বা একনিষ্ঠতাও হারিয়ে যায়নি? আজ আমরা নিজের অজান্তেই যেন হজ্জ ও ওমরাহকে এক প্রকার আধ্যাত্মিক পর্যটনে পরিণত করে ফেলেছি। ইহরামের কাপড় গায়ে জড়িয়ে রবের ভয়ে অন্তর কাঁপার বদলে আমাদের হাত ব্যস্ত থাকে নিখুঁত একটি সেলফি তোলার চিন্তায়। কা‘বা চত্বরে দাঁড়িয়ে রবের কাছে চোখের পানি ফেলার চেয়ে আমরা অনেক সময় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আপলোড করতে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

২. হজ্জে ইখলাছ ও নিয়তের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা :

যেকোন ইবাদতের প্রাণ হ’ল ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা। হজ্জের মত দীর্ঘ, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য ইবাদতে নফস বা প্রবৃত্তির ধোঁকা সবচেয়ে বেশী থাকে। তাই সালাফে ছালেহীন হজ্জের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে অন্তরের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার প্রতি সবচেয়ে বেশী জোর দিতেন। তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল যেকোন মূল্যে ‘হজ্জে মাবরূর’ বা কবুল হজ্জ অর্জন করা এবং সদ্যভুমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ হওয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য সম্পাদন করেনি, সে হজ্জ হ’তে ফিরবে সদ্য প্রসবিত সন্তানের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়)’।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন, وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ‘কবুল হজ্জের পুরস্কার কিছুই নেই জান্নাত ব্যতীত’।[১০] হাসান বাছরী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, হজ্জে মাবরূর (মকবুল হজ্জ) কী? তিনি উত্তরে বললেন, أَنْ تَعُودَ زَاهِدًا: فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الآخِرَةِ ‘হজ্জ থেকে এমন অবস্থায় ফিরে আসা যে, দুনিয়ার প্রতি তোমার অনীহা তৈরি হবে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে’।[১১] ইমাম ইবনে আব্দিল বার্র (রহঃ) কবুল হজ্জের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন, ‘আর মাবরূর হজ্জ হ’ল এমন এক হজ্জ যার মধ্যে কোন লৌকিকতা (রিয়া) এবং যশের আকাঙ্ক্ষা (সুম‘আ) থাকে না; যাতে কোন অশ্লীলতা (রাফাস) ও পাপাচার (ফুসুক) থাকে না এবং যা হালাল অর্থ দ্বারা সম্পাদিত হয়’।[১২]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ‘আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর’ *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৯৬)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ক্বারাফী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতের ‘লিল্লাহ’ শব্দটার নিয়ে ভাবুন। আল্লাহ ছালাত বা অন্য ইবাদতের ব্যাপারে ‘লিল্লাহ’ (আল্লাহ্র জন্য) বলেননি। কারণ ‘হজ্জ ও ওমরাহতে বেশী পরিমাণে রিয়া হয়ে থাকে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিষয়টা প্রমাণিত। বহু হাজী আছেন যারা হজ্জের কোন আলোচনা শুনলেই নিজের বা অন্যের হজ্জে কী ঘটেছিল সেটা বলা শুরু করে। হজ্জ ও ওমরাহ যেহেতু রিয়া তথা লৌকিকতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র, সেহেতু এ দু’টির ব্যাপারে ‘লিল্লাহ’ বলা হয়েছে ইখলাছের উপর গুরুত্বারোপ করে’।[১৩]

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, ‘নবী কারীম (ছাঃ) একটি জীর্ণ উটের জিন এবং এমন একটি পুরনো চাদর গায়ে দিয়ে হজ্জ করেছিলেন যার মূল্য চার দিরহামও হবে কি-না সন্দেহ। এরপর তিনি (দো‘আ করে) বললেন, اللَّهُمَّ حَجَّةً لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً ‘হে আল্লাহ! এমন একটি হজ্জ নছীব করুন যার মধ্যে লৌকিকতা (রিয়া) নেই এবং খ্যাতির মোহ (সুম‘আ) নেই’।[১৪]

নবীর এই সুন্নাহকে বুকে ধারণ করে সালাফগণ হজ্জে নিজেদের বিনয়ী করে রাখতেন। একবার ওমর (রাঃ) হজ্জের সফরে মক্কায় ছিলেন। তিনি তার পাশে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘তোমরা উস্কোখুস্কো চুলে, ধূলিধূসরিত অবস্থায়, ঘাম ও ময়লাযুক্ত দেহে এবং রোদে পুড়ে (হজ্জ করছ); অথচ এর বিনিময়ে তোমরা দুনিয়াবী কোন তুচ্ছ বস্তু আশা করছ না। আমাদের জানামতে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সফর আর নেই। তিনি আরও বলেন, إِنَّمَا الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ ‘প্রকৃত হজ্জকারী তো সেই, যে এলোমেলো চুল ও ঘর্মাক্ত অবস্থায় থাকে’।[১৫] মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট বলল, ‘হজ্জযাত্রীর সংখ্যা কত বেশী!’ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, مَا أَقَلَّهُمْ! ‘তাদের সংখ্যা কতই না কম!’ অতঃপর তিনি জীর্ণশীর্ণ ও রশির লাগামযুক্ত এক উষ্ট্রারোহীকে দেখে বললেন, لَعَلَّ هَذَا ‘সম্ভবত এ-ই (প্রকৃত হজ্জকারী)’।[১৬] কাযী শুরাইহ (রহঃ) বলেন, ‘হজ্জকারী অল্প, কিন্তু আরোহী অনেক। ভালো কাজের ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন এমন লোকের সংখ্যা কত বেশী, কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি প্রত্যাশীদের সংখ্যা কতই না কম!’[১৭]

---

৯. বুখারী হা/১৫২১; মুসলিম হা/১৩৫০; মিশকাত হা/২৫০৭।
১০. বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮।
১১. ইবনু জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ২/২৬৩।
১২. ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ, ১৩/৫৭৪।
১৩. আবুল আব্বাস আল-ক্বারাফী, আয-যাখীরাহ, ৩/১৭৪।
১৪. ইবনু মাজাহ, হা/২৮৯০; ছহীহুত তারগীব হা/১১২২; সনদ ছহীহ।
১৫. ইবনে রজব হাম্বলী, লাতায়েফুল মা‘আরেফ, পৃ. ২৩৭।
১৬. আব্দুর রাযযাক ছান‘আনী, মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৫/২৪১।
১৭. ইবনে রজব হাম্বলী, লাতায়েফুল মা‘আরেফ, পৃ. ২৩৬।

সালাফদের সেই ধূলিধূসরিত, রিয়ামুক্ত হজ্জের বিপরীতে আজ আমাদের হজ্জের রূপ কতটা বদলে গেছে! আমাদের হজ্জের প্রস্তুতি শুরু হয় সবচেয়ে দামী আর বিলাসবহুল প্যাকেজ খোঁজার মধ্য দিয়ে। আমাদের ইহরামের শুভ্র বসনও আজ যেন স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বায়তুল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে যেখানে আমাদের চোখের পানিতে বুক ভাসানোর কথা ছিল, সেখানে আমরা ব্যস্ত থাকি নিজেকে সুন্দরভাবে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করতে। তাওয়াফের চক্করগুলো আজ লাইভ ভিডিওতে পরিণত হয়েছে। হজ্জ থেকে ফিরে এসে মানুষের কাছে নিজের সফরের গল্প শোনানো এবং নামের আগে 'আলহাজ্জ' উপাধি শোনার জন্য আমাদের কান উন্মুখ হয়ে থাকে। আল্লাহুল মুস্তা'আন।

৩. ইহরাম ও তালবিয়া পাঠে সালাফদের অবস্থা :

ইহরাম বাঁধা হজ্জ ও ওমরাহ্র অন্যতম রুকন। মীক্বাত থেকে ইহরামের শুভ্র কাপড় গায়ে জড়িয়ে যখন একজন মুমিন 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন, তখন তিনি মূলত আকাশ-জমিনের একচ্ছত্র মালিকের দরবারে একজন সমর্পিত দাস হিসাবে নিজের উপস্থিতির জানান দেন। সালাফে ছালেহীনের কাছে ইহরাম ও তালবিয়া ছিল গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির এক অনন্য মুহূর্ত। জুরাইরী (রহঃ) বলেন, একবার আমরা প্রখ্যাত ছাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তিনি 'যাতু ইরাক্ব' থেকে ইহরাম বাঁধলেন। আমরা তাঁকে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকির ছাড়া অন্য কোন কথা বলতে শুনিনি'। অতঃপর তিনি (আনাস (রাঃ) বললেন, يَا ابْنَ أَخِي هَكَذَا الإِحْرَامُ 'হে ভ্রাতুষ্পুত্র! ইহরাম এভাবেই হ'তে হয়'।[১৮] হুমাম বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি বলেন, فَلَمَّا أَحْرَمَ لَمْ أَقْدِرْ أُكَلِّمُهُ حَتَّى حَلَّ، مِنْ شِدَّةِ اتِّقَاهُ عَلَى إِحْرَامِهِ 'তিনি (আনাস রা.) যখন ইহরাম বাঁধলেন, তখন থেকে হালাল হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগই পাইনি। ইহরামের পবিত্রতা ও বিধান রক্ষার প্রতি তাঁর তীব্র সতর্কতা ও তাক্বওয়ার কারণেই এমনটি হয়েছিল'।[১৯] খোলাফায়ে রাশেদার প্রখ্যাত বিচারক কাযী শুরাইহ (রহঃ) যখন ইহরাম বাঁধতেন, তখন (গভীর ধ্যানমগ্নতা ও নীরবতার কারণে) তাঁকে যেন একটি বধির সাপ মনে হতো (كَأَنَّهُ حَيَّةٌ صَمَّاءُ)'।[২০]

তালবিয়া পাঠে ছাহাবায়ে কেরামের আবেগ ও তীব্রতা কেমন ছিল সে ব্যাপারে প্রখ্যাত তাবেঈ আবূ হাযেম আল-আশজা'ঈ (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ যখন ইহরাম বাঁধতেন, তখন (তালবিয়া পাঠ করতে করতে) রাওহা নামক স্থানে পৌঁছানোর আগেই তাঁদের কণ্ঠস্বর ভেঙে যেত'।[২১] বকর বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, 'আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে তালবিয়া পাঠে উচ্চস্বর করতে শুনেছি। এমনকি আমি পাহাড় থেকে তাঁর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পেতাম'।[২২] আইয়ুব (রহঃ) বলেন, 'আমি সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.)-কে মসজিদে হজ্জযাত্রীদের (তালবিয়া পাঠের জন্য) জাগ্রত করতে দেখেছি'।[২৩] তবে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি ফুটে ওঠে আলী ইবনুল হুসাইন (রাঃ)-এর বর্ণনায়। সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ) হজ্জ করতে বের হ'লেন। যখন তিনি ইহরাম বাঁধলেন এবং তাঁর সওয়ারী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন ভয়ে তাঁর চেহারা হলুদ হয়ে গেল, শরীর কাঁপতে শুরু করল এবং তাঁর উপর এক কম্পন দশা সৃষ্টি হ'ল। তিনি 'লাব্বাইক' পাঠ করতে পারছিলেন না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি কেন লাব্বাইক পড়ছেন না? তিনি বললেন, আমি এই ভয়ে ভীত যে, আমাকে না জানি বলা হয়– 'লা লাব্বাইকা ওয়া লা সা'দাইকা' *(তোমার হাযিরা কবুল নয় এবং তোমার জন্য কোন কল্যাণও নেই)*। এরপর যখন তিনি লাব্বাইক পড়লেন, তখনই মূর্ছা গেলেন এবং সওয়ারী থেকে পড়ে গেলেন। হজ্জের পুরোটা সময় তাঁর এই অবস্থা বারবার হ'তে লাগল।[২৪] সুবহানাল্লাহ!

৪. কা'বা দর্শন ও তাওয়াফে সালাফদের অবস্থা :

রবের ঘরের প্রতি সালাফদের তীব্র ব্যাকুলতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখা যায়। একবার খোরাসান থেকে একদল মুসলিম হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় রওনা হ'লেন। তাদের সাথে ছিলেন একজন মহিলা। মসজিদুল হারামে ঢোকার পর মহিলাটি বলতে লাগলেন, أَيْنَ بَيْتُ رَبِّي؟ أَيْنَ بَيْتُ رَبِّي؟ 'আমার রবের ঘরটা কোথায়? আমার রবের ঘরটা কোথায়?' তাকে বলা হল, 'এখনই আপনি আপনার রবের ঘরের কাছে পৌঁছে যাবেন'। হারাম চত্বরে ঢোকার পর তিনি কা'বা ঘর দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। অতঃপর তাকে কা'বা ঘর দেখিয়ে বলা হল, 'এটাই আপনার রবের ঘর'। মহিলাটি কা'বায় হেলান দিয়ে গালটা কা'বার সাথে মিশিয়ে দিলেন। পরম আবেগে অনবরত কেঁদেই চললেন। আর সেই কাঁন্নারত অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করলেন'।[২৫] এই ঘরকে ভালোবেসে বারবার ছুটে এলেও সালাফদের অন্তরে সবসময় এক ধরনের ভয় কাজ করত। আলী ইবনুল মুওয়াফফাক (রহঃ) বলেন, আমি ষাটবার হজ্জ করেছি। এরপর একদিন আমি হাতীমে (কা'বার দেয়ালঘেরা অংশ) বসে নিজের অবস্থা এবং বারবার এই পবিত্র স্থানে আসা নিয়ে ভাবছিলাম। আমি জানি না,

১৮. *ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৭/২২; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, ৯/৩৬৬।*
১৯. *ইবনে সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৫/৩৩৬।*
২০. *শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/১০৪; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১১৩।*
২১. *ইবনু তাইমিয়াহ, শারহু উমদাতিল ফিক্বহ, ৪/৪২২। আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল ওমরাহ, পৃ. ১৭।*
২২. *ইবনে তাইমিয়াহ, শারহু উমদাতিল ফিক্বহ, ৪/৪২২।*
২৩. *ইবনে তায়মিয়াহ, শারহু উমদাতিল ফিক্বহ, ৪/৪২২।*
২৪. *আবূ হামিদ গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/২৬৮।*
২৫. *মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব আল-ফাকেহী (মৃ. ২৭২হি.), আখবারু মাক্কাহ (বৈরূত : দারু খিযর, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খ্রি.), ১/১৬৭*

আমার হজ্জ কি কবুল হয়েছে নাকি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে! এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং স্বপ্নে একজনকে বলতে শুনলাম, 'তুমি কি তোমার ঘরে এমন কাউকে দাওয়াত দাও, যাকে তুমি ভালবাসো না? তিনি বলেন, এরপর আমি জাগ্রত হ'লাম এবং আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল'।[২৬]

কা'বা চত্বরে তাওয়াফরত অবস্থায় সালাফগণ মানুষের প্রতি, বিশেষ করে পিতা-মাতার প্রতি খেদমতের কি অনন্য নযীর স্থাপন করেছেন, তা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি। একবার আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি দেখলেন, এক ইয়ামনী ব্যক্তি নিজের মাকে পিঠে বহন করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছে এবং (কবিতার ছন্দে) বলছে, إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ + إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرِ 'আমি আমার মায়ের এক অনুগত উট (বাহন); তাঁর অন্য বাহনগুলো যদি ভয় পেয়ে পালিয়েও যায়, আমি কখনো (তাঁকে ছেড়ে) ভয় পাব না বা পালাব না'। অতঃপর তাওয়াফ শেষে সে ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'হে ইবনে ওমর! আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি?' ইবনে ওমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ 'না, এমনকি তাঁর প্রসব-বেদনার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও তুমি দিতে পারোনি'।[২৭] আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ নাজীহ বলেন, 'আমি তাউস ইবনে কায়সান (রহঃ)-কে তাওয়াফ করতে দেখেছি, তাঁর চেয়ে সুন্দরভাবে কাউকে তাওয়াফ করতে দেখিনি। তিনি ডানে-বামে তাকাতেন না। এত শান্তশিষ্টভাবে তাওয়াফ করতেন, মনে হত যেন তাঁর মাথার ওপর পাখি বসে আছে।[২৮]

৫. যমযমের পানি পানে সালাফদের মহতী উচ্চাকাঙ্ক্ষা :

সালাফগণ যখন যমযমের পেয়ালা হাতে তুলে নিতেন তখন কেবল তৃষ্ণা মেটানোর সাধারণ আবেগ কাজ করত না; বরং তাঁদের হৃদয়ে জেগে উঠত পাহাড়সম কোন আশা বা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। তাঁদের কাছে যমযম ছিল রবের দরবারে মনোবাঞ্ছা পূরণের এক সোনালী মাধ্যম, যা পার্থিব জগতের তুচ্ছ চাহিদার ঊর্ধ্বে উঠে জান্নাত ও ইলমের পথে পা বাড়াতে সাহায্য করত। হাসান ইবনে ঈসা বলেন, আমি ইবনুল মুবারককে দেখলাম, তিনি জমজমের কূপে এসে এক বালতি পানি তুললেন। এরপর কা'বার দিকে মুখ করে বললেন, হে আল্লাহ! নবী কারীম (ছাঃ) তো বলেছেন, مَاءُ زَمْزَمَ، لِمَا شُرِبَ لَهُ 'জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় তা পূরণ হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/ ৩০৬২; সনদ ছহীহ)*। 'হে আল্লাহ! আমি ক্বিয়ামত দিবসের তৃষ্ণা মেটানোর উদ্দেশ্যে এটি পান করছি'। এরপর তিনি তা পান করলেন।[২৯]

একবার ইমাম ইবনে খুযাইমা (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল যে, তিনি এই অগাধ ইলম কোথা থেকে পেলেন? তখন তিনি বললেন, 'আমি যখনই জমজমের পানি পান করেছি, আল্লাহ্র কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করেছি'।[৩০] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি নির্ভুল লক্ষ্যভেদী (তীরন্দাজ) হওয়ার নিয়তে জমজমের পানি পান করেছিলেন। ফলে তিনি ১০টি তীরের মধ্যে ৯টিই লক্ষ্যস্থলে লাগাতে পারতেন।[৩১] হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) নিজে বলেন, আমি যখন হাদীছ শিক্ষার শুরুতে ছিলাম, তখন একবার জমজমের পানি পান করেছিলাম এবং আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যেন তিনি আমাকে হাদীছ মুখস্থ রাখার ক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর স্তরের হিফয দান করেন। এর বিশ বছর পর আমি যখন পুনরায় হজ্জে গেলাম, তখন নিজের মাঝে সেই স্তরের চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলাম এবং আল্লাহ্র কাছে আরও বড় মর্তবা প্রার্থনা করলাম। আশা করি আল্লাহ তা কবুল করবেন।[৩২]

ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওজিইয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যখন আমি মক্কায় অবস্থান করতাম, তখন মাঝেমধ্যে এমন তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা অনুভব করতাম যে আমার চলাফেরা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ত– বিশেষ করে তাওয়াফের সময়। তখন আমি দ্রুত সূরা ফাতিহা পাঠ করে ব্যথার স্থানে মাসাহ করতাম। সাথে সাথে মনে হ'ত যেন কোন পাথর পড়ে গেল (অর্থাৎ ব্যথা উধাও হয়ে যেত)। আমি এটি বহুবার পরীক্ষা করেছি। আমি এক পেয়ালা যমযম পানি নিতাম এবং তাতে বারবার সূরা ফাতিহা পড়ে পান করতাম। এর ফলে আমি এমন উপকার ও শক্তি অনুভব করতাম যা সাধারণ ওষুধে কখনো পাইনি।[৩৩] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আরো বলেছেন, 'আমি ও অন্যান্যরা যমযমের পানি দ্বারা চিকিৎসার আশ্চর্যজনক কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমি এ পানি দিয়ে বিভিন্ন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছি এবং আল্লাহ্র অনুমতিতে আমি সুস্থ হয়েছি। আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি প্রায় অর্ধ মাস বা তারও বেশী সময় ধরে শুধু যমযমের পানি পান করে জীবনযাপন করেছেন। কিন্তু তিনি ক্ষুধা অনুভব করেননি এবং তিনি মানুষের সাথে তাওয়াফ করতেন যেমন অন্যরা করে। তিনি আমাকে বলেছেন যে, কখনও কখনও তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত এভাবে কাটিয়েছেন এবং তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখার শক্তি ছিল, তিনি ছিয়াম রাখতেন এবং বারবার তাওয়াফ করতেন'।[৩৪]

৬. ছাফা-মারওয়া সাঈতে সালাফদের অবস্থা :

ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গায় সাঈ করা হজ্জ ও ওমরাহ্র অন্যতম রুকন। হাজেরা (আ.)-এর সেই নির্জন মরুপ্রান্তরে পানির জন্য তৃষ্ণার্ত দৌড়াদৌড়িকে আল্লাহ

২৬. ইবনু রজব হাম্বলী, লাতায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ৬৬।
২৭. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/১১; আলবানী, সনদ ছহীহ।
২৮. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১০৬।
২৯. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, ৩২/৪৩৬; হাফেয যাহাবী, তাহযীবু তাহযীবুল কামাল ৫/২৮০।
৩০. শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২/২০৮।
৩১. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, শারহু সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ২২০।
৩২. আল-হাত্তাব, মাওয়াহিবুল জলীল ফী শারহি মুখতাসারিল খালীল, ৩/১১৬; মুহাম্মাদ সালেম মাজলিসী, লাওয়ামি'উদ দুরার, ৪/৫৩৩।
৩৩. ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিইয়াহ, মাদারিজুস সালেকীন, ১/৮০।
৩৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ, ৪/৫৮৪।

ক্বিয়ামত পর্যন্ত হাজীদের জন্য ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন। সালাফদের কাছে সাঈ ছিল আল্লাহ্র রহমতের সন্ধানে এক ভিখারীর অস্থিরতার মতোই। আয়েশা (রাঃ) অসুস্থতার কারণে দুই বছর ওমরাহ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি ছাফা ও মারওয়ার মাঝে সওয়ারীতে চড়ে সাঈ করা অপসন্দ করি'।[৩৫] যদিও অসুস্থ অবস্থায় বাহনে চড়ে সাঈ করার অনুমতি শরী'আতে রয়েছে, কিন্তু সালাফগণ আল্লাহ্র দরবারে বিনয় প্রকাশের জন্য নিজের পায়ে হেঁটে কষ্ট করাকেই বেশী ভালোবাসতেন। প্রখ্যাত ছাহাবী যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন শরীরে শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন লাঠিতে ভর দিয়ে ছাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন।[৩৬] তাবেঈ তাউস ইবনে কায়সান (রহঃ) ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর কা'বার দিকে মুখ করে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং দো'আ করতেন।[৩৭]

৭. হজ্জে সালাফদের ধৈর্য ও সহনশীলতা :

হজ্জ হ'ল ধৈর্যের এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। সালাফদের কাছে হজ্জের ভিড় ছিল ক্বিয়ামতের ময়দানের মহড়া, আর উত্তপ্ত মরুভূমি ছিল জাহান্নামের অগ্নি-উত্তাপের এক মৃদু স্মরণিকা। যেখানে সাধারণ মানুষ ভিড় আর গরমে মেজায হারিয়ে ফেলে, সেখানে সালাফগণ খুঁজে পেতেন আধ্যাত্মিক প্রশান্তি। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ছিলেন খলীফার পুত্র এবং উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ। কিন্তু হজ্জের সফরে তিনি নিজেকে একজন সাধারণ গোলামের চেয়েও অধম মনে করতেন। তিনি হজ্জের সময় কখনো চাইতেন না যে, মানুষ তাঁর জন্য রাস্তা ছেড়ে দিক বা তাঁকে বিশেষ কোন মর্যাদা দান করুক। তিনি প্রায়ই পায়ে হেঁটে হজ্জ করতেন এবং সাধারণ মানুষের মত ভিড়ের মাঝে মিশে গিয়ে তওয়াফ ও সাঈ করতেন। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ও ভিড়ের চাপকে তিনি সানন্দে বরণ করে নিতেন। তিনি বলতেন, 'হজ্জ তো হ'ল উস্কোখুস্কো চুল আর ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহের ইবাদত'।[৩৮]

বায়তুল্লাহতে সালাফদের ধৈর্যের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। একবার মসজিদুল হারামে একজন লোক হজ্জ করতে এসে মসজিদেই ঘুমিয়ে পড়ল। বাতাসে তার পেটের উপর থেকে কাপড় সরে গেল। পেটের যে জায়গায় সে বেল্ট বেঁধে রেখেছিল, সেটা উন্মোচিত হয়ে গেল। ভেতরে থাকা মুদ্রাগুলো প্রকাশিত হ'ল। তার বন্ধুরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখতে পেয়ে সেটা চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করল। তাই তারা সেটা খুলে নিজেদের কাছে রেখে দিল। ঘুম থেকে ওঠার পর লোকটা দেখতে পেল বেল্টের জায়গাটা খালি। সে ডানে-বামে তাকিয়ে কাউকে পেল না। শুধু আত্বা ইবন আবী রাবাহ (রহঃ)-কে ছালাত আদায় করতে দেখল। ছালাত শেষ হ'লে সে তাঁর জামার কলার ধরে টেনে বলল, 'ওহে আল্লাহ্র শত্রু! যা করার তা করে এখন ছালাতে দাঁড়িয়ে গেছিস!' আত্বা (রহঃ) বললেন, কী হয়েছে আপনার?' সে বলল, আমার বেল্ট খুলে এর থেকে সব মুদ্রা নিয়ে গেছিস! তিনি জানতে চাইলেন সেখানে কত মুদ্রা ছিল। লোকটি বলল- দুইশ দীনার। তিনি বললেন, আপনি ছাড়া এটা আর কেউ জানে? সে না সূচক উত্তর দিল। তখন আত্বা (রহঃ) লোকটাকে আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং তার হাতে দুইশত দিনার দিয়ে দিলেন।

লোকটা বন্ধুদের কাছে গিয়ে ঘটনা জানালে তারা বলল, 'আল্লাহ্র কসম! তুমি লোকটার উপর যুলুম করেছ। মূল ঘটনা হ'ল বাতাসে কাপড় উড়ে যাচ্ছিল দেখে আমরা তোমার পেট থেকে খুলে নিয়েছিলাম। এই নাও তোমার বেল্ট'। এবার লোকটা বন্ধুদের নিয়ে আত্বার কাছে গেলেন। তার ব্যাপারে মক্কাবাসীকে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানালো, 'তিনি হ'লেন প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা ইবন আবী রাবাহ, মক্কাবাসীদের ফক্বীহ ও সর্দার'। তারা তার কাছে গিয়ে মাফ চাইলো। দীনারগুলো ফেরত দিতে চাইল। তিনি বললেন, 'নাহ! এগুলো আমার কাছে ফিরবে না। চলে যান, আপনাকে আমি মাফ করে দিলাম আর এগুলো দিয়ে দিলাম'।[৩৯] একবার ভাবুন তো! আত্বা (রহঃ)-এর মতো আমাদের কাউকে যদি চুরির অপবাদ দিত, তবে কি আমরা মেজাজ ধরে রাখতে পারতম? এই ঘটনা আমাদের শেখায় যে, হজ্জের সফর কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন নয়; বরং ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এক বাস্তব প্রশিক্ষণ। যেখানে অন্যায় অপবাদ ও কষ্টের মুখেও নিজেকে সংযত রাখা একজন প্রকৃত হাজীর বৈশিষ্ট্য। তিনি অকারণে অপমানিত হয়েও রাগ বা প্রতিশোধ না নিয়ে শান্তভাবে সহ্য করেছেন, নিজের সম্পদ দিয়ে অপবাদকারীকে সাহায্য করেছেন এবং ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং হজ্জের সময় ভীড়, ক্লান্তি বা ভুল বোঝাবুঝির মুহূর্তে রাগান্বিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা, মানুষের প্রতি সদয় হওয়া এবং ক্ষমার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে সুন্দরভাবে সমাধান করাই হ'ল প্রকৃত তাকওয়ার পরিচয়। কেননা এই গুণগুলোর মাধ্যমেই হজ্জ শুধু বাহ্যিক ইবাদত না থেকে অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের পথে পরিণত হয়।

হিশাম বিন উরওয়াহ (রহঃ) যখন অতি বৃদ্ধ অবস্থায় হজ্জ করতেন, তখনও তিনি জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময় প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্য দিয়েই তা সম্পাদন করতেন। তাঁর এই কষ্ট দেখে যখন বলা হ'ল, 'হে আবূ মুনযির! আপনি যদি একটু দেরী করতেন এবং ভীড় কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন (তবে কি ভালো হ'ত না?) উত্তরে তিনি বললেন, 'বান্দাকে (এই ভীড় ও সংকটের মাধ্যমে) পরীক্ষায় ফেলা হয়, যাতে আল্লাহ দেখতে পারেন যে, এমন ভীড়ের স্থানেও বান্দা কতটা ধৈর্যের পরিচয় দেয়'।[৪০] সুবহানাল্লাহ! তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ভীড়ের কষ্টকে আল্লাহ্র পরীক্ষা মনে করে হাসিমুখে বরণ করেছেন। আর আমরা এসি বাসে একটু গরম লাগলে,

---

৩৫. ফাকিহী, আখবারু মাক্কা, ২/২৩৬।
৩৬. ফাকিহী, আখবারু মাক্কা, ২/২৩৬।
৩৭. ফাকিহী, আখবারু মাক্কা, ২/২২৮।
৩৮. ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার, ৪/৩৫৫।
৩৯. আবুল আরব আত-তামীমী, আল-মিহান, পৃ. ৩৪৪।
৪০. ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৪/৩৫৫।

হোটেলের লিফট আসতে দেরী হলে কিংবা খাবারের লাইনে একটু ভীড় দেখলেই আয়োজকদের, মুয়াল্লিমকে এবং পুরো ব্যবস্থাকে গালমন্দ করতে শুরু করি। এমনকি সঊদী সরকারকেও গালি দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এভাবে আমাদের হজ্জের সফরের অর্ধেক সময় কাটে মানুষের সাথে ঝগড়া করে আর বাকী অর্ধেক কাটে অভিযোগ করে।

৮. মিনা প্রান্তরে সালাফদের অবস্থা :

মিনার প্রান্তর হ'ল ক্ষণস্থায়ী জীবনের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। চারদিকে কেবল তাঁবুর সারি, যা মুমিনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই দুনিয়াও এক অস্থায়ী তাঁবুর মত, যেখানে আমরা কেবল গুটিকয়েক দিনের মুসাফির। এটি এমন এক স্থান যেখানে আমীর-ফকীর, রাজা-প্রজা সবাই একই তাঁবুর নিচে, একই ধুলাময় পরিবেশে আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করে। মিনার এই দিনগুলোতে সালাফগণ দুনিয়ার সমস্ত জাঁকজমক ও বিলাসিতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে এক অনাড়ম্বর ও সমর্পিত জীবনে অভ্যস্ত হ'তেন। পাশাপাশি এই পবিত্র ভূমির প্রতিটি ধূলিকণা ও তরুলতার প্রতিও তাঁরা অপরিসীম শিষ্টাচার ও সতর্কতা প্রদর্শন করতেন। মিনায় অবস্থানকালে আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) কেবল হাজীদের শৃঙ্খলা নয়; বরং মক্কার পবিত্র ঘাস ও গাছের সুরক্ষায়ও ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। ওবায়েদ বিন উমায়ের আল-লাইসী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ওমর (রাঃ) মিনায় খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি পাহাড়ের উপর গাছ কাটছে। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'তুমি কি জানো না যে, মক্কার গাছ কাটা বা ঘাস উপড়ানো নিষেধ?' লোকটি উত্তর দিল, 'জ্বি জানি, কিন্তু আমার উটটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল (তাই নিরুপায় হয়ে করছিলাম)'। ওমর (রাঃ) তাকে অন্য একটি উটের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'আর কখনো এমন করো না।'[৪১]

মিনার প্রান্তরে দুনিয়াবী বিলাসিতার বিরুদ্ধে সালাফদের অবস্থান কতটা আপোষহীন ছিল, তা সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-এর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে ফুটে ওঠে। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকালে আমাকে খলীফা আল-মাহদীর নিকট নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহকে ভয় করুন! আপনি আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছেন এবং এই মর্যাদা লাভ করেছেন, তা কেবল মুহাজির ও আনছারদের তলোয়ারের বদৌলতে। অথচ আজ তাঁদের সন্তানরাই ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। (স্মরণ করুন!) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন হজ্জ করেছিলেন, তখন তিনি মাত্র পনেরো দিনার ব্যয় করেছিলেন এবং গাছের ছায়ায় অবস্থান করতেন। খলীফা আল-মাহদী আমাকে বললেন, 'আপনি কি চান আমি আপনার মত হয়ে যাই? আমি উত্তরে বললাম, 'না, আপনাকে আমার মত হ'তে হবে না। তবে আপনি বর্তমানে যে বিলাসিতার মধ্যে আছেন তা থেকে কিছুটা নিচে নামুন, আর আমি যে অবস্থায় আছি তা থেকে কিছুটা উপরে উঠুন (অর্থাৎ, মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন)। তখন খলীফা আমাকে বললেন, এখান থেকে বেরিয়ে যান![৪২]

সালাফগণ হজ্জের সফরকে মাবরূর ও অধিক ছওয়াবপূর্ণ করার জন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে মিনা-আরাফার পথ পাড়ি দেওয়াকে পসন্দ করতেন। ইসমাঈল বিন আব্দুল মালেক (রহঃ) বলেন, 'আমি সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.)-কে ইয়াওমুত তারবিয়াহ (৮ই জিলহজ্জ) দিনে দেখলাম তিনি মসজিদুল হারামে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলেন, তারপর মক্কা থেকে পায়ে হেঁটে মিনার উদ্দেশ্যে বের হ'লেন। তিনি মিনা পর্যন্ত হেঁটেই গেলেন এবং সেখানে গিয়ে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও (পরদিন ৯ই জিলহজ্জের) ফজর ছালাত আদায় করলেন'।[৪৩] ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর সন্তানদের বলতেন, 'হে আমার সন্তানেরা! তোমরা যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হবে, তখন পায়ে হেঁটে হজ্জ পালন করবে'।[৪৪] মিনায় অবস্থানকালে আমাদের উচিত সালাফদের মতো সাদাসিধে থাকা। অতি উন্নত খাবার বা ভিআইপি সুবিধার পেছনে না ছুটে সাধারণ হাজীদের মতো ইবাদতে মগ্ন হওয়া। ওমর (রাঃ) যেভাবে মিনার ঘাস ও গাছের প্রতি যত্নশীল ছিলেন, আমাদেরও উচিত মক্কার পরিবেশের প্রতি সম্মান দেখানো। যত্রতত্র ময়লা ফেলা, প্লাস্টিকের বোতল ছুড়ে ফেলা, নিজের সামান্য সুবিধার জন্য হারাম এলাকার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকাই হ'ল প্রকৃত হজ্জের আদব।

৯. আরাফার ময়দানে সালাফদের অবস্থা

আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের অপরিহার্য রুকন। আরাফার মহান দিনে আল্লাহ্র রহমতের আশায় সালাফদের ত্যাগের চিত্রগুলো আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। হাকিম বিন হিযাম (রাঃ) আরাফার ময়দানে একশ'টি কুরবানীর পশু এবং একশ জন দাস নিয়ে উপস্থিত হন। এরপর তিনি তাঁর সকল দাসকে (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য) মুক্ত করে দেন।[৪৫] একইভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ)-এর ঘটনা আরও হৃদয়স্পর্শী। তিনি হজ্জ পালন করতে এসেছিলেন এবং তাঁর সাথে ত্রিশটি সওয়ারী উট ছিল। অথচ তিনি নিজে পায়ে হেঁটে চলছিলেন যতক্ষণ না আরাফায় অবস্থান নিলেন। সেখানে তিনি ত্রিশজন দাসকে মুক্ত করে দিলেন, তাদের ঐ ত্রিশটি সওয়ারীর উপর আরোহণ করালেন এবং তাদের ত্রিশ হাযার দিরহাম প্রদান করলেন। এরপর বললেন, 'আমি তাদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলাম, যেন এর অসীলায় তিনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন'।[৪৬]

ইবাদতে মগ্ন থাকার পাশাপাশি সালাফদের অন্তরে সবসময় নিজেদের পাপের ভয় প্রবলভাবে জাগ্রত থাকত। মুতারিফ

৪১. *ইবনে আবী আরূবাহ, আল-মানাসিক, পৃ.* ৭৩।

৪২. *ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল,* ১/১০৬; *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া,* ৭/৪৩।

৪৩. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ,* ৮/৩৬১।

৪৪. *তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর,* হা/১২৫২২।

৪৫. *লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ.* ২৮৪।

৪৬. *আয-যামাখশারী, রবীউল আবরার ওয়া নুসূসুল আখইয়ার,* ২/৩০৬; *শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুস্তাত্বরাফ, পৃ.* ১৯।

ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর এবং বকর আল-মুযানী (রহঃ) আরাফায় অবস্থানকালে তাঁদের একজন বললেন, اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ مِنْ أَجْلِي ‘হে আল্লাহ! আমার (পাপের) কারণে আজকের এই আরাফাবাসীদের ফিরিয়ে দেবেন না (অর্থাৎ আমার কারণে যেন তাদের দো‘আ কবুল হওয়া আটকে না যায়)’।[৪৭] অর্থাৎ তাঁর ভয় ছিল, নিজের গুনাহের কারণে হয়তো পুরো ময়দানের মানুষের দো‘আই আটকে যেতে পারে!

আরাফার বিকেলের প্রতিটি ক্ষণ তাঁরা শুধু যিকির ও রোনাজারিতে কাটিয়ে দিতেন। দাঊদ ইবনে আবূ আছেম (রহঃ) বলেন, ‘আমি আরাফার মাঠে সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ)-এর সাথে অবস্থান করলাম তাঁর আমল দেখার জন্য। তিনি অনবরত যিকির ও দো‘আয় মগ্ন থাকলেন, যতক্ষণ না মানুষ সেখান থেকে ফিরতে শুরু করল (অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত)’।[৪৮] এই মহামূল্যবান সময়ে মানুষের কোলাহল থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়ে আত্বা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) বলেছেন, ‘যদি আরাফাতের দিন বিকেলে নিজেকে সবার থেকে আলাদা করে নির্জনে (ইবাদতে) মগ্ন থাকা সম্ভব হয় তবে তাই কর’।[৪৯] আর আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়ার এই শ্রেষ্ঠতম দিনে অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়াকে তাঁরা চরম বোকামি মনে করতেন। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে আরাফার ময়দানে মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে দেখলেন। তিনি বললেন, ‘হে অক্ষম ব্যক্তি! আজকের এই দিনেও তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে হাত পাতছো?[৫০]

আরাফায় সালাফদের কান্নার তীব্রতা কেমন ছিল, তা ফুযাইল ইবনে ইয়াজ (রহ.)-এর ঘটনা থেকে বোঝা যায়। তিনি আরাফায় দাঁড়িয়ে সন্তানহারা শোকাতুর মায়ের মতো এমনভাবে ডুকরে কাঁদছিলেন যে, কান্নার তীব্রতায় তিনি দো‘আই করতে পারছিলেন না। সূর্য যখন প্রায় ডুবুডুবু, তখন তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে এক বুকফাটা আর্তনাদ করে বললেন, ‘হায় আফসোস! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিলেও আপনার সামনে দাঁড়াতে আমার বড় লজ্জা হচ্ছে’।[৫১] সুবহানাল্লাহ! আরাফার ময়দানে আল্লাহ্‌র ক্ষমার প্রতি তাঁদের কত সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তা সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-এর ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, ‘আরাফার দিন বিকেলে আমি সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন দুই হাঁটু গেড়ে বসা ছিলেন এবং তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। তা দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আজকের এই সমাবেশে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় কে আছে? তিনি বললেন, الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُغْفَرَ لَهُمْ ‘যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করবেন না’।[৫২]

১০. মুযদালিফাতে সালাফদের অবস্থা :

আরাফার ময়দানে দিনভর রোনাজারি আর অশ্রুজলে বুক ভাসানোর পর মুযদালিফার রাত হ’ল এক অন্যরকম প্রশান্তির রাত। খোলা আকাশের নিচে, কোন তাঁবু বা আচ্ছাদন ছাড়া ধুলোমাখা এক চিলতে মাটিতে শুয়ে রবের সান্নিধ্য অনুভবের এক অপূর্ব মুহূর্ত এটি। মুযদালিফায় রবের প্রতি সালাফদের কি এক অদ্ভুত লাজুকতা আর সমর্পণের অনুভূতি ছিল তা প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা (রহঃ)-এর জীবনের শেষ হজ্জের ঘটনা থেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর ভাতিজা হাসান ইবনে ইমরান বর্ণনা করেন, ‘আমি আমার চাচা সুফিয়ানের সাথে তাঁর জীবনের শেষ হজ্জে (১৯৭ হিজরী) ছিলাম। যখন আমরা মুযদালিফায় পৌঁছালাম এবং তিনি মাগরিব ও এশার ছালাত শেষে বিছানায় (মাটিতে) হেলান দিলেন, তখন এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ‘আমি টানা ৭০ বছর ধরে এই স্থানে আসছি এবং প্রতি বছরই বলি, ‘হে আল্লাহ! এই স্থানটিতে এটাই যেন আমার শেষ আসা না হয়। কিন্তু এবার বারবার এই দো‘আ করতে আমার আল্লাহ্‌র প্রতি লজ্জা বোধ হচ্ছে’। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি মক্কা থেকে ফিরে যান এবং পরবর্তী বছরেই (১৯৮ হিজরী) পহেলা রজব শনিবার ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মক্কার জান্নাতুল মুয়াল্লায় দাফন করা হয়।[৫৩]

১১. হজ্জের সফরে সালাফদের অবস্থা ও ইবাদত :

হজ্জের প্রতিটি রোকন, চাই তা তওয়াফ হোক, সাঈ হোক কিংবা জামারাতে পাথর নিক্ষেপ–সবকিছুরই মূল উদ্দেশ্য হ’ল আল্লাহ্‌র স্মরণ কায়েম করা। সালাফে ছালেহীন হজ্জের সফরে কেবল শারীরিক পরিশ্রমকেই যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং তাঁরা প্রতিটি কদমে তাসবীহ, তাহলীল এবং তিলাওয়াতে মশগূল থাকতেন। হজ্জে সবাই একই কাজ করেন, একই পোশাক পরেন এবং একই স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য তৈরি হয় তাঁদের অন্তরের উপস্থিতি এবং জিহ্বায় আল্লাহ্‌র যিকিরের আধিক্য দিয়ে। এ বিষয়ে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘হজ্জ পালনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ’লেন সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ তা‘আলার যিকির বা স্মরণে সবচেয়ে বেশী মগ্ন থাকেন’।[৫৪]

সফরের ক্লান্তিতেও সালাফদের রাতের ইবাদত থেমে থাকত না। আব্দুস সামাদ ইবনে সুলায়মান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কাছে রাত্রী যাপন করলাম। তিনি আমার (ওযূর) জন্য একটি পাত্রে পানি রেখে দিলেন। যখন সকাল হ’ল তিনি দেখলেন যে আমি পানি ব্যবহার করিনি (অর্থাৎ রাতে ইবাদতের জন্য উঠিনি)। তখন তিনি বললেন, ‘একজন হাদীছ অন্বেষী (তালেবে ইলম)

৪৭. ইবনে রজব হাম্বলী, লাতায়েফুল মা‘আরেফ, পৃ. ২৮৫।
৪৮. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ৮/৫১৫।
৪৯. আহমাদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ৩০৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৩৩৬।
৫০. নববী, আল-ইযাহ ফী মানাসিকিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ, পৃ. ২৮৮।
৫১. ইবনু রজব, লাত্বায়েফুল মা‘আরেফ, পৃ. ২৮৫।
৫২. ইবনে আবিদ্দুনয়া, হুসনুয যান্নি বিল্লাহ, পৃ. ৯২।
৫৩. ইবনু জারীর তাবারী, তারীখুর রুসূল ওয়াল মুলূক, ১১/৬৬১।
৫৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব, পৃ. ৭৫।

রাত কাটাবে, অথচ রাতে তাঁর কোন আমল বা অযীফা থাকবে না (এটা হ'তে পারে না)'। আমি বললাম, 'আমি তো মুসাফির'। তিনি বললেন, 'মুসাফির হ'লেও কি (আমল ছাড়তে হবে)? মাসরূক (রহঃ) হজ্জ করেছেন অথচ তিনি (সফরের রাতগুলোতেও) সিজদারত অবস্থা ছাড়া ঘুমাননি'।[৫৫]

যিকির ও ইবাদতের পাশাপাশি হজ্জের সফরে সালাফদের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সহযাত্রীদের খেদমত করা এবং নিজেদের সর্বোচ্চ বিলিয়ে দেওয়া। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السَّفَرِ لِأَخْدُمَهُ، فَكَانَ يَخْدِمُنِي 'আমি সফরে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গী হয়েছিলাম তাঁর খেদমত করার জন্য, কিন্তু (উল্টো) তিনি নিজেই আমার খিদমত করতেন'।[৫৬] সহযাত্রীদের প্রতি ভালোবাসা ও ত্যাগের সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)। হজ্জের সময় ঘনিয়ে এলে মার্ভের অধিবাসীরা তাঁর সাথে হজ্জে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করত। তিনি তাদের সবার হজ্জের খরচের টাকা নিজের কাছে জমা নিয়ে একটি বাক্সে তালাবদ্ধ করে রাখতেন। এরপর মার্ভ থেকে বাগদাদ হয়ে মক্কা পর্যন্ত পুরো সফরে তাদের যাতায়াত, সর্বোত্তম খাদ্য ও মিষ্টান্নের যাবতীয় ব্যয় তিনি নিজের পকেট থেকে বহন করতেন। শুধু তাই নয়, মদীনা ও মক্কা থেকে তাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপহার তিনি নিজের টাকায় কিনে দিতেন। হজ্জ শেষে এলাকায় ফিরে সবার বাড়ী-ঘর মোজাইক করে দিতেন এবং তিনদিন পর বিশাল ভোজের আয়োজন করতেন। পরিশেষে সেই তালাবদ্ধ বাক্সটি খুলে সবার মূল জমানো টাকার থলেগুলো, যার উপর তাদের নাম লেখা ছিল, তা অবিকল ফেরত দিতেন![৫৭]

হজ্জের সফরে সালাফগণ কাউকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে খুবই সজাগ থাকতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একবার হজ্জ করতে গিয়ে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের কাছে খুব ভীর দেখতে পেলেন। তখন তিনি বলেলেন, إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا فَلَا تُؤْذِ وَلَا تُؤْذَ، وَامْضِ 'যখন তুমি রুকন-এর (হাজরে আসওয়াদ বা রুকনে ইয়ামানী) কাছে ভিড় দেখবে, তখন কাউকে কষ্ট দিও না এবং নিজেও কষ্ট পেও না; বরং তুমি (সেখান থেকে ভিড় না করে তওয়াফ চালিয়ে) সামনে এগিয়ে যাও'।[৫৮] মূলত হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা বা রুকন ইয়ামনী স্পর্শ করা সুন্নাত, কিন্তু অন্যকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দেওয়া বা নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া হারামের পর্যায়ে পড়তে পারে। সেজন্য ইবনে আব্বাস (রাঃ) এখানে মূল ইবাদতের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনে জুরাইজ বলেন, 'আত্বা (রহঃ) ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত তাওয়াফে মগ্ন থাকতেন এবং কারও সাথে কোন কথা বলতেন না।[৫৯] ইব্রাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, كَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ أَنْ لَا يَخْرُجُوا مِنْهَا حَتَّى يَخْتِمُوا الْقُرْآنَ 'সালাফগণ যখন মক্কায় আসতেন, তখন কুরআন খতম না করে সেখান থেকে বের হওয়াকে তাঁরা অপসন্দ করতেন (অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানকালে অন্তত একবার কুরআন খতম করাকে তাঁরা অত্যন্ত পসন্দনীয় মনে করতেন)'।[৬০] আমরাও কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগটি গ্রহণ করতে পারি। বাংলাদেশ থেকে হাজীগণ সাধারণত হজ্জের সফরে এক থেকে দেড় মাস অবস্থান করেন। একটু সচেতন হ'লেই এই সময়ের মধ্যে কয়েকবার কুরআন খতম করা সম্ভব, ইনশাআল্লাহ। কারণ সেখানে ইবাদত, ঘুম ও খাওয়া-দাওয়া ছাড়া অন্য কোন জাগতিক ব্যস্ততা নেই। নেই সংসার, চাকরী কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝামেলার দুশ্চিন্তা। তাই জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়, সকাল-সন্ধ্যার তাসবীহ-তাহলীল ও রাতের তাহাজ্জুদসহ যাবতীয় নেক আমলে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আর নিয়ত থাকতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে হবে যে, আল্লাহ যেন আমাদেরকে আজীবনের জন্য নিয়মিত উক্ত ইবাদত-বন্দেগী অভ্যস্ত করেন।

উপসংহার :

সালাফদের হজ্জের পবিত্র সফর কেবল মক্কা-মদীনার ভৌগলিক সীমানায় ঘুরে আসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি ছিল তাদের জন্য জীবনকে নবরূপে গড়ে তোলার সফর। আজ আমরা যখন আধুনিক যানবাহনে চড়ে বিলাসিতার চাদর মুড়ি দিয়ে হজ্জ শেষ করি, তখন আমাদের ফিরে তাকানো উচিত সেই ধূলিধূসরিত কাফেলার দিকে। যাঁদের ইহরামের কাপড়ে লেগে থাকত আল্লাহভীরুতার ঘ্রাণ, যাঁদের তালবিয়াতে কেঁপে উঠত মরুভূমির আকাশ-বাতাস। তাঁদের সেই অশ্রুসিক্ত আরাফা, বিনম্র মিনা আর যমযমের পানি পানের সেই গভীর প্রত্যয় আজও আমাদের প্রেরণার উৎস। তাঁরা হজ্জ থেকে ফিরে আসতেন এমনভাবে যেন তাঁরা নতুন করে পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়েছেন। সুতরাং আমরা যখন মক্কার সেই পবিত্র মাটি ছেড়ে নিজ দেশে ফিরে আসবো, তখন নিজের হৃদয়ের কাছে বারবার প্রশ্ন করবো যে, আমি কি সালাফদের সেই হজ্জের ছিটেফোঁটা স্বাদ পেয়েছি? আমার ভেতরকার অহংকার, ক্রোধ ও দুনিয়াপ্রীতি কি আরাফার ময়দানে বিসর্জন দিয়ে আসতে পেরেছি? যদি আমাদের হজ্জ আমাদের জীবনকে বদলে না দেয়, আমাদের চোখকে আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রুসিক্ত করতে না শেখায়, তবে বুঝতে হবে আমরা কেবল মরুভূমির উত্তাপ গায়ে মেখে এসেছি, রহমতের পরশ পাইনি। আসুন! আমরা হজ্জের সেই রুহানিয়াতকে সজীব করি। আমাদের প্রতিটি 'লাব্বাইক' যেন কেবল ঠোঁটের উচ্চারণ না হয়ে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উচ্চারিত হয়। আল্লাহ আমাদের রিয়ামুক্ত হজ্জে মাবরূর নছীব করুন- আমীন!

---

৫৫. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, ৩/১৬৬।
৫৬. ইবনে রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/২৯৫।
৫৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৬৮-৩৬৯; তারীখু বাগদাদ ১০/১৫৭-১৫৮।
৫৮. ইমাম ফাকিহী, আখবারু মাক্কা, ১/১০৩।
৫৯. আখবারু মাক্কাহ, ১/২৪৩।
৬০. আল-আযরাক্বী, আখবারু মাক্কাহ, ২/১৩২।

মাসায়েলে কুরবানী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা বিধিবদ্ধ হয়। ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বিধায় এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত মাসায়েল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে'।[১]

২. চুল-নখ না কাটা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে।[২] (খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : এটি 'ঈদের নিদর্শন' *(আল-মুগনী ২/২৫৬)*। ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব -এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে দুই বা তিন বার করে ও অন্যান্য সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত *(নায়েল ৪/২৭৮)*। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে। ইমাম তাকবীর দিলে তারাও তাকবীর দিবে *(ইরওয়া হা/৬৪৯-৫৪, ৩/১২১-২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'।[৫] এছাড়া 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন।[৬]

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ছয় হাত উপরে *(মির'আত ৫/৬২)* উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর বা অন্য কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৭] তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন *(আহমাদ হা/২৩০৩৪)*। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[৮]

৮. মহিলাদের ঈদের ছালাত : (ক) ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, যেন আমরা ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবেন। জনৈকা মহিলা বললেন, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৯] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন। **(খ)** পুরুষদের জামা'আতে শরীক হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ'লে মহিলাগণ ঘরে একাকী বা নিজেদের ইমামতিতে জামা'আত সহকারে ঈদের ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। বরং তারা এতে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১০]

৯. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে ছালাতের তাকবীর শেষে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১১]

ছয় তাকবীরের অবস্থা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে।[১২] এবং ৫+৪ 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে *(হা/৫৬৮৫, ৫৬৮৯)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে *(হা/৫৭৪৬-৪৭)* ইবনু আব্বাস, মুগীরা বিন শো'বাহ ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে যে আছারগুলি এসেছে সবই যঈফ।[১৩] এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর

---

১. *বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০।*
২. *মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯।*
৩. *আহমাদ হা/৬৫৭৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; মির'আত হা/১৪৯৩, ৫/১১৭ পৃ.।*
৪. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।*
৫. *ইরওয়া ৩/১২৫; মির'আত ৫/৭০।*
৬. *যা-দুল মা'আদ ২/৩৬০-৬১ পৃ.।*
৭. *বুখারী হা/৯৫৩; মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০।*
৮. *বায়হাক্বী ৩/২৮৩; সুবুলুস সালাম হা/৪৫৪-এর আলোচনা।*
৯. *বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
১০. *বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৯৯, ৩০/২৭৭ পৃ.।*
১১. *মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।*
১২. *আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩, এবং ঐ তাখরীজ-আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ., হাদীছ যঈফ।*
১৩. *তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী 'ঈদায়নের তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৫৩৪-এর আলোচনা, ৩/৮০-৮৮ পৃ.।*

'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারী আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম'।[১৪]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়[১৫], তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ সেখানে ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (আটটি অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'।[১৬]

১০. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : ওযূ সহ ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতেহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। এর আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।

১১. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা মতে ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি।[১৭] মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ এসেছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[১৮]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা কারণ ছাড়াই খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন।

১২. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানা হ'তে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে 'সুন্নাতে ইব্রাহীমী' হিসাবে প্রচলিত।[১৯] এটি ইসলামের অন্যতম 'মহান নিদর্শন' *(মির'আত ৫/৭৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে প্রতি বছর কুরবানী করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*। তিনি বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[২০] এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[২১]

১৩. কুরবানীর সময়কাল : ঈদুল আযহার ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২২] অতঃপর ১১, ১২, ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিনে রাত-দিন যেকোন সময় কুরবানী করা যাবে *(মির'আত ৫/১০৬ পৃ.)*।

১৪. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- ছাগল, গরু ও উট। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[২৩] এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার কোন প্রমাণ নেই। কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[২৪] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*। উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয়। বরং এতে পাঁঠা ছাগলের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং গোশত রুচিকর হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে দু'টি মোটাতাজা খাসি দিয়ে কুরবানী করেছেন।[২৫]

১৫. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[২৬] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯ পৃ.)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৬. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, -'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[২৭] আলবানী বলেন, 'এর অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে উম্মতকে শরীক করা।

---

১৪. বায়হাক্বী ৩/২৯১; মির'আত ৫/৫১।
১৫. আবু দাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩; ছহীহাহ হা/২৯৯৭।
১৬. ইবনু হাযম, মুহাল্লা মাসআলা ক্রমিক : ৫৪৩, ৫/৮৪-৮৫ পৃ.।
১৭. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯।
১৮. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩।
২১. মির'আত ৫/৭১-৭৩ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্র.।
২২. বুখারী হা/৫৫৬২; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।
২৩. আন'আম ৬/১৪৩-৪৪; হজ্জ ২২/৩৪।
২৪. তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।
২৫. ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, ৪/৩৫১ পৃ.; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত হা/১৪৭৬, ৫/৯১-৯২ পৃ.।
২৬. মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।
২৭. মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির'আত ১/৭৬।

কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি ছাগল একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়'।[২৮] **(খ)** আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় কুরবানীর রীতি কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, ছাহাবীগণ নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি বকরী কুরবানী দিতেন। অতঃপর নিজেরা খেতেন ও অন্যদের খাওয়াতেন। এমনকি লোকেরা বড়াই করত। সেই রীতি চলছে যেমন তুমি দেখছ।[২৯] **(গ)** ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। **(ঘ)** বিদায় হজ্জে আরাফার দিন সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, রজব মাসের 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৩০] আর 'কুরবানী' অর্থ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দিন যে পশু যবহ করা হয়।[৩১] অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন, সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৭. কুরবানীতে শরীক হওয়া : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম।[৩২] **(খ)** হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[৩৩] **(গ)** তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[৩৪]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে বুঝা যায় যে, সফরে সাতজনে মিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করা যায়। যাতে এইসব বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়। এটি উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। সেকারণ লায়েছ বিন সা'দ (রহঃ) উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর বিষয়টি সফরের সাথে 'খাছ' বলেছেন।[৩৫] যদিও জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে বাড়ীতে ও সফরে সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮৫)*। কেননা জাবের (রাঃ) বর্ণিত 'একটি গরু বা উট সাত জনের পক্ষ হ'তে'।[৩৬] হাদীছটি মুৎলাক্ব। যেখানে বাড়ীতে বা সফরে বলে কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত আবুদাঊদ ২৮০৭ ও ২৮০৯ নম্বর হাদীছে এটি হজ্জ ও হোদায়বিয়ার সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা এসেছে। অতএব দলীলের ক্ষেত্রে একই রাবীর বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছের স্থলে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদী সম্মত রীতি।

অনেকে ৭-এর বদলে ৩, ৫, ১০ ভাগে কুরবানী করেন, যা প্রমাণহীন। অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দেন, আবার একটি গরুর ভাগা নেন। অনেকে বকরী বা খাসী না দিয়ে বড় গরুতে ভাগী হন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার জন্য। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর নেকী তিনি কিভাবে পাবেন? অথচ প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে একটি পশু কুরবানী করাই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশনা।[৩৭] অতএব মুক্বীম অবস্থায় প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই সুন্নাত সম্মত।

১৮. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়। তবে বাম কাতে ফেলতে ভুলে গেলে দোষের কিছু হবে না *(মির'আত ৫/৭৫)*। কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম *(মির'আত ৫/৭৪)*।

১৯. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ সবার চাইতে বড়) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৫/৭৬)*।

২০. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেননি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৩৮] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায়।[৩৯]

২১. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন।[৪০] অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৪১]

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, প্রকাশকাল : ১৪৪৪ হি./২০২৩ খৃ.]।

---

২৮. *মিশকাত হা/১৪৫৪-এর টীকা।*
২৯. *তিরমিযী হা/১৫০৫; ইরওয়া হা/১১৪২, ৪/৩৫৫ পৃ.।*
৩০. *তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮; মির'আত ৫/১১৪-১৫।*
৩১. *মির'আত ৫/৭১; হজ্জ ২২/৩৪।*
৩২. *তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৯; মির'আত হা/১৪৮৪, ৫/১০১-২ পৃ.।*
৩৩. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।*
৩৪. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।*
৩৫. *মুহাল্লা, মাসআলা ক্রমিক : ৯৮৪, ৬/৪৫।*
৩৬. *আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮।*
৩৭. *আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪ পৃ.।*
৩৮. *তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮।*
৩৯. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮।*
৪০. *মুসলিম হা/১৩১৭; বুখারী হা/১৭১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮।*
৪১. *বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৬৩৮; মির'আত হা/২৬৬২-এর আলোচনা, ৯/২৩০ পৃ.।*

হজ্জের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

- ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ। সামর্থ্যবানদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ ফরয। একজন মুমিনের সারা জীবনের স্বপ্ন থাকে হজ্জ পালনের। তবে হজ্জ কেবল মক্কা সফর কিংবা কাবা পরিদর্শন নয়; নয় কেবল এক লম্বা শারীরিক সফর, বরং এটি রূহ বা আত্মার এক পরম যাত্রা। এটি মহান রবের সান্নিধ্যে মহা তৃষিত হৃদয়ের এক বিনীত আত্মসমর্পণের মহাকাব্য। হজ্জের দীর্ঘ, ক্লান্ত-শ্রান্ত সফর আমাদের গভীরভাবে শেখায়– সব কোলাহলের শেষে আমরা সত্যিই ভীষণ একা। আমাদের পরম আশ্রয় কেবলই এক এবং একক সেই সত্ত্বা আমাদের মহান রব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এই যে সফরের কষ্ট, এই যে রোদপোড়া ধূলিমলিন চেহারা–এ সবের মাঝে যেন লুকিয়ে থাকে মাটির মানুষের পক্ষ থেকে তার মহান স্রষ্টার প্রতি এক প্রাণঢালা ভালোবাসা, যেখানে ভাষা হারিয়ে যায়, যেখানে চোখের পানি আর 'লাব্বাইক' ধ্বনিতে বান্দার নীরব প্রেমের ভাষা আকাশের পানে ছুটে চলে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে ছুটে আসেন একই পোশাকে, একই তালবিয়ার স্বরে, একই উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু হজ্জের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে যে গভীর আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক তাৎপর্য লুকিয়ে আছে, তা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন না। এই প্রবন্ধে হজ্জের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হ'ল।

১. পরকালীন প্রস্তুতির সফর :

হজ্জ এমন এক সফর যার মাঝে ফুটে ওঠে মৃত্যু পরবর্তী ক্বিয়ামত দিবসের এক জীবন্ত মহড়া। যখন কোন হাজী তার সেলাই করা নিত্য পরিহিত পোশাকগুলো খুলে দু'টুকরো সাদা ইহরাম পরিধান করেন, তখন সেটি তাকে ভিতর থেকে মনে করিয়ে দেয় কবরে শেষ যাত্রার পোষাক তথা কাফনের কথা। এই কাফন গায়ে জড়িয়ে সে যেন যাবতীয় দাম্ভিকতা, আত্মমর্যাদার দাবী বিসর্জন দিয়ে পরম বিনয়ের চাদর গায়ে জড়িয়ে নেয়। ইহরামের শুভ্রতা তার হৃদয়ের যাবতীয় অপবিত্রতা আর কলুষতাকে ধুয়ে দেয় এবং মনে করিয়ে দেয় সেই চিরন্তন বার্তা যে, আমি মাটি থেকে এসেছি, একদিন মাটিতেই মিশে যাব; মাঝখানে বেঁচে থাকবে কেবল আমার সৎআমলগুলো।

হজ্জের প্রতিটি কাজই যেন পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মিনার তাঁবু যেন অস্থায়ী দুনিয়ার প্রতীক। মানুষ তার স্থায়ী ঠিকানাকে সাজাতে কতই না আয়োজন করে! কিন্তু মিনার তাঁবুতে এসে সে বুঝতে পারে, সামান্য একটি তাঁবু বা কাপড়ের ছাদের নিচেও জীবন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব। এভাবে দুনিয়ার মোহমুক্তির এক বড় পাঠ সে পেয়ে যায়। রাসূল (ছা.) বলেছেন, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ 'পৃথিবীতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন আগন্তুক বা পথচারী *(বুখারী হা/৬৪১৬)*।' মিনার তাঁবু যেন ঠিক এই হাদীছেরই বাস্তব রূপ। এখানে হাজীরা মাত্র কয়েক দিনের জন্য আসেন, সাথে থাকে সামান্য কিছু আসবাবপত্র। এই বিশাল পৃথিবীটাও যেন আমাদের জন্য এক অস্থায়ী তাঁবুর মত, যেখান থেকে একদিন আমাদের বিদায় নিতেই হবে। তাঁবুতে বসে হাজীদের মনে সবসময় একটা তাড়া থাকে যে, কখন আরাফায় যেতে হবে, কখন মক্কায় ফিরতে হবে। এই 'অস্থায়ীত্বের বোধ' আমাদের শেখায় যে, দুনিয়াটাও একটা মুসাফিরখানা, এখান থেকেও একদিন হুট করে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠবে।

মিনার তাঁবু আমাদের আরো শেখায় আমাদের জীবনটা এমন এক অপেক্ষা, যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ডাকের জন্য অপেক্ষা করছি। পরকালের দীর্ঘ সফরের তুলনায় আমাদের এই কয়েক ঘন্টার জীবনটা মিনার কয়েকটা দিনের অবস্থানের মতই সংক্ষিপ্ত। বিলাসবহুল অট্টালিকা ছেড়ে তাঁবুর অতি সাধারণ ঠিকানা হাজীদেরকে শেখায় ধৈর্য আর অল্পে তুষ্টি। মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের প্রকৃত আরাম এই দুনিয়ায় নয় বরং জান্নাতের স্থায়ী নিবাসে।

তারপর আরাফার ময়দানে পৌঁছে যখন হাজীরা একই পোষাক গায়ে জড়িয়ে মহান রবের দরবারে হাত তোলে, তখন যেন মনে হয় হাশরের ময়দানকে সে স্বচক্ষে দেখে। কী ভয়ংকর সুন্দর সে দৃশ্য! সেই ময়দানের সুবিশাল জনস্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে সততই মনে হয়, কিয়ামত দিবস বুঝি উপস্থিত, আজ সব ভেদাভেদ মিলিয়ে গেছে, দুনিয়াবী সব চাওয়া-পাওয়া ভোলার দিন আজ, আজ শুধু প্রভুর সান্নিধ্য লাভের দিন। সুবহানাল্লাহ!

হজ্জের সারাংশই হল এই আরাফাত। আরাফাতের এই বিশাল ময়দানে দাঁড়িয়ে লাখো লাখো মানুষ একসাথে কাঁদে, একসাথে দো'আ করে। সূর্যের খরতাপে ঘাম ঝরে, পাপের স্মৃতি চোখের জলে ধুয়ে যায়। আত্মা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র সামনে নত হয়, অহংকারের প্রাচীর ভেঙেচুরে সমান হয়ে যায়, রহমতের বৃষ্টিতে হৃদয়-মন ধুয়ে নতুন সত্ত্বার জন্ম হয়। এই দিনে মহান রব যত ইনসানকে ইহসান করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, তা অন্য কোন দিনে আর হয় না *(মুসলিম হা/১৩৪৮)*।

সুফিয়ান ছওরী (রহ.)-এর মত মনীষীরা আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে এমনভাবে কম্পিত হ'তেন, যেন তারা সরাসরি আল্লাহ্‌র দরবারে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কাছে তালবিয়া বা 'লাব্বাইক' বলা ছিল মহান রবের কাছে নিঃশর্ত আত্মোৎসর্গের এক আকুল আর্তি। আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে তাঁরা অনুভব করতেন যেন ক্বিয়ামতের দিন এসে গেছে। পাপের ভার মাথায় নিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতেন, আর মরু বিয়াবানে আল্লাহ্‌র রহমতের বৃষ্টিতে ভেজার আশায় চেয়ে থাকতেন। তাদের দৃষ্টিতে হজ্জ ছিল আত্মার পরিশুদ্ধির সবচেয়ে কোমল এবং গভীরতম মুহূর্ত, যেখানে মানুষ নিজেকে ভুলে শুধু আল্লাহকে খুঁজে পায়।

'আরাফাত' শব্দটি এসেছে 'আরাফা' থেকে, যার অর্থ 'জানা' বা 'চিনতে পারা'। এখানে মানুষ আল্লাহকে চেনে শুধু জ্ঞানের মাধ্যমে নয়, বরং হৃদয়ের অনুভূতিতে। এটি যেন 'আলাস্তু বিরব্বিকুম'—'আমি কি তোমাদের রব নই?—এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিকাল। আত্মা এখানে স্মরণ করে কোথায় তার আসল উৎস আর কী ছিল রবের কাছে দেয়া তার সেই প্রতিশ্রুতি!

আরাফাতের বিশাল আবেগঘন পাহাড়ের পাদদেশ থেকে নেমে এসে শান্ত সমাহিত পরিবেশে নিরাভরণভাবে আল্লাহকে ডাকার স্থানই মুযদালিফা।

যদি মিনার তাঁবু হয় দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের প্রতীক, তবে মুযদালিফা হ'ল কবর জীবনের এক ক্ষুদ্র মহড়া, যেখানে মানুষের জাগতিক পদমর্যাদার কোন মূল্য নেই। এখানে কোটিপতি থেকে রাস্তার ফকীর, নারী-পুরুষ আবালবৃদ্ধবণিতা— সবাই একই আকাশের নিচে, একই বালুর বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকে। অবতারণা হয় এক অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় দৃশ্যের; যার কোন তুলনা নেই।

এখানে মানুষে মানুষে কোন দেয়াল থাকে না, কোন লুকোচুরি থাকে না, কোন আভিজাত্য থাকে না। খোলা আকাশের নিচে কয়েক লক্ষ মানুষের এই নীরব রাত্রিযাপন যেন চিৎকার করে বলে যায়— 'হে মানুষ! তুমি শূন্য হাতে এসেছিলে, এই ধুলিমাখা প্রান্তরের মাটির বিছানাই তোমার শেষ শয্যা হতে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি পাথেয় গুছিয়ে নাও।'

'মুযদালিফা' শব্দটির অর্থ হ'ল নিকটে আসা বা মিলিত হওয়ার স্থান। বান্দা যখন দুনিয়ার সব আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এই মরুপ্রান্তরে ধূলিমলিন অবস্থায় রাত কাটায়, তখন সে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সে হৃদয় দিয়ে খুব গভীরভাবে অনুভব করে—'দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকা বা প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় *(সূরা আলে-ইমরান ১৮৫)*।

সর্বোপরি হজ্জের মূল উদ্দেশ্য হ'ল দুনিয়াবী মোহমুক্তি ঘটিয়ে আখেরাতমুখী নতুন জীবন শুরু করা। যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সংকল্প গ্রহণ করা। আরাফাতে দাঁড়িয়ে মানুষ অনুভব করে ক্বিয়ামতের প্রস্তুতি। তার পাপের বোঝা হালকা হয়ে হৃদয় নতুন করে জন্ম নেয়। এজন্যই এই সফর পরকালীন সফরের এক আদর্শতম প্রস্তুতিস্বরূপ।

২. তাওহীদের মূর্ত প্রতীক :

হজ্জ কেবল পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ক্লান্ত সফর নয়; বরং এটি হ'ল তাওহীদের এক উন্মুক্ত প্রশিক্ষণকাল। মিনার তাঁবু, আরাফাতের ময়দান থেকে শুরু করে মুজদালিফার রাত এবং মিনার কঙ্কর নিক্ষেপ—সবই যেন এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। একজন হাজী যখন হজ্জ শেষে ফিরে আসেন, তখন তার হৃদয়জুড়ে কেবলই থাকে তাওহীদের বিকীর্ণ নূর।

হজ্জের মূল মন্ত্র হ'ল তালবিয়াহ— *'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক...'*। এর অর্থ হ'ল, 'আমি উপস্থিত হে আল্লাহ! তোমার কোন শরীক নেই।' লাখ লাখ মানুষের কণ্ঠে একই সাথে এই ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে কুঠারাঘাত করা হয় শিরকের মূলে এবং প্রকাশ পায় তাওহীদের অনুপম শ্রেষ্ঠত্ব।

হজ্জ মূলত হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সেই তাওহীদী আহ্বানের উত্তর, যা তিনি হাযার বছর আগে দিয়েছিলেন। তিনি যেভাবে এক আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন, হাজীরা তাদের হজ্জের মাধ্যমে শপথ নেন সেই একত্ববাদের আদর্শেই নিজের জীবন গড়ার।

কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘুরে, তখন তা এটিই প্রমাণ করে যে— মুমিনের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু কেবল একজনই, আর তিনি হলেন আল্লাহ। যেমন গ্রহ-নক্ষত্র সূর্যের চারপাশে ঘোরে, তেমনি সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌র চারপাশে ঘুরে চলেছে। প্রতিটি তাওয়াফে মানুষ অনুভব করে—আমি আল্লাহ্‌রই দাস, তাঁরই কেন্দ্রে আমার জীবনের সবকিছু। প্রতি চক্করে তার পাপের বোঝা হালকা হয়, হৃদয় নরম হয়, আর দো'আ যেন যমীন থেকে আকাশ ছুঁয়ে যায়। এ যেন আত্মার কেন্দ্রস্থলে ফিরে আসার এক মহা উপলক্ষ্য। হাজীরা কখনও কাবার পূজা করে না, বরং কাবার মালিকের ইবাদত করে। এভাবেই তাওয়াফ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহর এক জীবন্ত নিদর্শন হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে শয়তানকে পাথর মারার অর্থ এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে আসার পথে সমস্ত বাধাকে প্রত্যাখ্যান করা। এটি তাওহীদের সেই দাবীকে শক্তভাবে ধারণ করে যেখানে বলা হয়— 'লা ইলাহা' (নেই কোন হক্ব উপাস্য) অর্থাৎ মিথ্যা সব উপাস্য ও শক্তিকে আগে বর্জন করা, তারপর 'ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া) বলে এক সত্তাকে গ্রহণ করা।

হজ্জ এভাবে শুধুমাত্র ক্লান্তিকর দীর্ঘ সফর নয়, বরং হৃদয়ের পূর্ণ ভাবাবেগ আর আনুগত্য নিয়ে মহান প্রভুর দরবারে হাজিরা দেয়ার নাম। হজ্জের প্রতিটি পদক্ষেপ হাজীদের হৃদয়ে তাওহীদের এক জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে ধরা দেয়। তাকে শিখিয়ে দেয় যে, জীবন ও মরণের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হলেন মহান আল্লাহ। তিনি বিনা সবকিছুই অর্থহীন। তার কাছে নিখাদ আত্মসমার্পণই মানবজীবনের মূল সার্থকতা।

৩. আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত :

ইহরামের শুভ্র কাপড় ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সকলকে একাকার করে ফেলে। দুনিয়ার সব সাজ-সজ্জা, সব অহংকার, সব মোহ ত্যাগ করে মানুষ আত্মহারা হয়ে যায়। ফলে আত্মার পরিশুদ্ধির এক শুভ্র সূচনা হয়, নফসের দাবী চুপ হয়ে যায়, আর হৃদয় ভরে ওঠে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায়।

বিদ্বানদের দৃষ্টিতে হজ্জ হ'ল বান্দার এক 'বিপ্লবী রূপান্তর'-এর নাম। কেননা হজ্জ নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে (Ego) কুরবানী করে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাগরে বিলীন হয়ে যাওয়ার নাম। এটি কোন পাথরের ঘরের চারদিকে ঘুরা নয়, বরং মানুষের নিজের অস্তিত্বের কেন্দ্র খুঁজে পাওয়ার এক অবিরাম চেষ্টা।

জামরাতের যে প্রতীকী যুদ্ধ, যা শয়তানকে পাথর ছোড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তা শুধু বাইরের শয়তান নয়; বরং নিজের অন্তরের কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, লোভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এটি শেখায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং শয়তানের প্ররোচনা প্রত্যাখ্যান করার অসাধারণ পাঠ। হাজী পাথর নিক্ষেপ করে তার নিজের অন্তরের ভেতর লুকিয়ে থাকা 'নফস' বা অহংকারের মূর্তিকে চূর্ণ করে, তার ভেতরের কুপ্রবৃত্তিকে ঘৃণাভরে আঘাত করে।

হজ্জের প্রতিটি রুকন, তাওয়াফ, সাঈ, আরাফায় অবস্থান—একেকটি আধ্যাত্মিক সেতু, যার মাধ্যমে মানুষের অন্তর আল্লাহ্র সান্নিধ্যে বিগলিত হয়, আত্মশুদ্ধি গভীর চর্চা হয় এবং জীবনের গতিপথ বদলে যায়। এটি যেন আল্লাহ্র রহমতের একটি নরম আলিঙ্গন, যার পরশে মানুষ পুরনো জীবন ভুলে নতুন করে জেগে ওঠে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় হজ্জের অভ্যন্তরীণ দিকগুলোকে উন্মোচন করেছেন যেন একটি মায়াবী আয়নায়। তিনি বলেন, 'যেহেতু হজ্জ একটি দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য সফর, যা শারীরিক শ্রম আর মানসিক দৃঢ়তা ছাড়া সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, তাই এই ইবাদতটি যখন একান্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, তখন তা মানুষের অতীত জীবনের সকল পঙ্কিলতাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়। হজ্জের এই ত্যাগ ও সাধনা পূর্বের সমস্ত গুনাহকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে দেয়, যেমনটি একজন অবিশ্বাসী ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বের সব পাপ মুছে গিয়ে সে নতুন জীবন পায় *(পৃ. ১/১৪২)*।' তিনি একে 'ঈমান আনয়ন'-এর সাথে তুলনা করেছেন এজন্য যে, ইসলাম গ্রহণের পর যেমন মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়, মাক্ববূল হজ্জও একজন মানুষকে তেমনি পবিত্র করে দেয়।

তিনি আরো বলেন, 'হজ্জ সমাজের যত কুপ্রথা আর অসার রসম-রেওয়াজ (শিরক-বিদআত)-কে সমূলে বিনাশ করে দেয়। সালাফে ছালেহীনদের সেই সোনালী দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তাঁদের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য হজ্জের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই' *(ঐ)*।

তিনি নিজের হজ্জের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, 'কোন মানুষ যখন সেই পবিত্র স্থানে গিয়ে উপনীত হয়, তখন ঐ মহিমান্বিত পরিবেশের রূহানী রং আর নূরানী আভা তার নিজের আত্মার ওপর প্রবলভাবে বিজয়ী হয়। আর আমি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) নিজে স্বচক্ষে এই সত্য প্রত্যক্ষ করেছি' *(ঐ)*।

তিনি আরো বলে, وَرُبَمَا يشتاق الْإِنْسَان إِلَى ربه أَشد شوق، فَيحْتَاج إِلَى شَيْء يقْضِي بِهِ شوقه فَلَا يجد إِلَّا الْحَج 'যখন মানুষের হৃদয়ে রবের বিরহ-বেদনা আর মিলনের আকুলতা সীমানা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেই ব্যাকুল তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সে এমন এক কিছু খোঁজে, যা তার অন্তরে গভীর অনুরাগের তৃপ্তি দিতে পারে। তখন হজ্জই হয়ে ওঠে সেই তৃষিত হৃদয়ের একমাত্র প্রশান্তি' *(ঐ)*।

হজ্জ কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদতই নয়, বরং এটি মানুষের চরিত্র সংশোধন এবং তাকে সব ধরনের অন্যায় ও অপরাধ থেকে দূরে রাখার এক কার্যকর প্রশিক্ষণ। হজ্জের সময় যাবতীয় অন্যায় ও অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ – فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ 'হজ্জের মাসসমূহ সুনির্ধারিত। সুতরাং যে ব্যক্তি এই মাসগুলোতে হজ্জের সংকল্প করে, তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (অশ্লীল কথা ও কাজ), পাপাচার এবং ঝগড়া-বিবাদ করা জায়েয নেই' *(সূরা বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। এই আয়াতে 'ফুসূক' (পাপাচার) এবং 'জিদাল' (বিবাদ) নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অপরাধকেও হজ্জের পবিত্রতার পরিপন্থী ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূল (ছা.) ঘোষণা করেছেন যে, 'হজ্জ মানুষকে এমনভাবে পাপমুক্ত করে যে তার চরিত্রে অপরাধের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না' *(বুখারী হা/১৮১৯)*। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছা.) বলেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করল এবং তাতে অশ্লীল কাজ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকল, সে (হজ্জ শেষে) এমনভাবে ফিরে আসল যেন আজই তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে (অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে গেল)।[১]

তাছাড়া ইহরাম বাঁধার পর হাজীদের জন্য এমন কিছু কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায় যা সাধারণত হালাল (যেমন, শিকার করা, সুগন্ধি মাখা বা চুল কাটা)। এই কঠোর নিয়ম হাজীকে শেখায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হালাল ছোট ছোট কাজ ছাড়তে পারে, তার পক্ষে মানুষের হক নষ্ট করা বা বড় বড় অন্যায় ছেড়ে দেওয়া আরও সহজ। অনুরূপভাবে হজ্জের ভিড় ও প্রতিকূলতা হাজীকে প্রচণ্ড ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। ফলে রাগের মাথায় গালি দেওয়া বা বিবাদে লিপ্ত হওয়ার মত কুপ্রবৃত্তি দমন হয়। এভাবেই হজ্জের মাধ্যমে একজন মানুষ তার ভেতরের পশুবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে এবং ছোট-বড় সকল অন্যায় থেকে আত্মরক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক নতুন 'মুত্তাকী' মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করে।

ইমাম গাযালীর দৃষ্টিতে হজ্জ কেবল একটি ইবাদত নয়, বরং এটি নিজের ভেতরের 'আমি'কে চেনার একটি বড় পরীক্ষা। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন, 'বলা হয়ে থাকে, সফরকে 'সফর' নামকরণ করা হয়েছে এই কারণে যে, তা মানুষের লুকানো চরিত্রকে উন্মোচিত (يسفر) করে দেয়। এই কারণেই হযরত উমর (রা.) যখন এক ব্যক্তিকে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জানার দাবী করতে দেখলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তার সাথে কোন সফরে সঙ্গী হয়েছিলে, যার মাধ্যমে মানুষের উন্নত চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়?' লোকটি উত্তর

১. *বুখারী হা/১৫২১, মুসলিম হা/১৩৫০।*

দিল, 'না'। তখন উমর (রা.) বললেন, 'তাহলে আমি মনে করি, তুমি তাকে চেনো না'।[২]

সুতরাং হজ্জ হ'ল সেই 'ল্যাবরেটরী' যেখানে একজন মুমিনের সামাজিক সততা ও ছবরের পরীক্ষা হয়। হজ্জের সফরে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা, পাওনা আদায়ে ছাড় দেওয়া এবং অন্যের কষ্ট সহ্য করা–এসব গুণই হ'ল 'মাকারিমুল আখলাক' বা উন্নত চরিত্র। যেমন ইমাম গাযালী বলেন, لَيْسَ حُسْنُ الْخُلُقِ كَفَّ الْأَذَى بل احتمال الأذى 'উত্তম চরিত্র কেবল কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম নয়; বরং অন্যের দেয়া কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করার নামই হ'ল উত্তম চরিত্র *(ঐ)*।'

সুতরাং যার হজ্জ তাকে অন্যের প্রতি দয়াশীল ও ধৈর্যশীল করতে পারল না, তার সফর কেবল দৈহিক পরিশ্রমেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ সামাজিক আদব বা লোকলজ্জার খাতিরে নিজের রাগ, লোভ বা সংকীর্ণতাকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু হজ্জের মত দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য সফরে যখন ক্ষুধা, ক্লান্তি এবং ভিড়ের চাপ তৈরি হয়, তখন মানুষের ভেতরের প্রকৃত রূপটি বেরিয়ে আসে। এভাবে হজ্জ আত্মনিরীক্ষার পথ ধরে আত্মশুদ্ধির কাজটি সহজতর করে তোলে।

৪. মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ :

বিশ্ব মুসলিমের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রতীক হিসাবে হজ্জ অসামান্য গুরুত্ব রাখে। বিশ্বজুড়ে যখন লাখ লাখ হাজী একত্রিত হন, তখন তা ইসলামের গাম্ভীর্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে। এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এক বিরাট প্লাটফর্ম। এটি তাওহীদী পতাকাতলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষদের এক বার্ষিক সমাবেশ; যেখানে মুমিনের ঈমান শাণিত হয়, মিল্লাতের ঐক্যবোধ সুদৃঢ় হয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) চমৎকারভাবে বলেন, 'একটি রাষ্ট্র যেমন নির্দিষ্ট সময় পরপর সামরিক কুচকাওয়াজ বা শক্তির মহড়ার আয়োজন করে, যাতে অনুগত ও বিদ্রোহীদের চেনা যায়, রাষ্ট্রের শৌর্য-বীর্য বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং নাগরিকরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে; ঠিক তেমনি মুসলিম উম্মাহর জন্য 'হজ্জ' হ'ল এক আবশ্যিক মহাসম্মিলন। হজ্জের মাধ্যমেই খাঁটি মুমিন আর কপট মুনাফিকের তফাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে, কীভাবে অগণিত মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাতলে আশ্রয় নিচ্ছে। হজ্জের এই প্রাঙ্গণে পৃথিবীর এক প্রান্তের মুসলমান অন্য প্রান্তের ভাইয়ের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে একে অপরের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মহৎ গুণাবলী বিনিময় করতে পারে। কেননা মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর উন্নত চরিত্র মূলত একে অপরকে দেখা এবং সৎ সাহচর্যের মাধ্যমেই বিকশিত হয়' *(ঐ)*।

হজ্জ হ'ল বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের মুমিনদের এক অভিন্ন মিলনমেলা, যেখানে বংশ, বর্ণ ও আভিজাত্যের দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। হৃদয়ে গেঁথে দেয় 'উম্মাহ'র চেতনা। সাদা কাপড়ে সবাই সমান, ধনী-গরীব, আরব-আজমের কোন পার্থক্য নেই। এ সত্যিই এক অপরূপ দৃশ্য!

বর্ণবাদ ও বৈষম্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত বিংশ শতাব্দীর অন্যতম আলোচিত আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ মানবাধিকার কর্মী ম্যালকম এক্স (১৯২৫-১৯৬৫ খৃ.) ইসলাম গ্রহণ করার পর ১৯৬৪ সালে যখন হজ্জের ময়দানে পা রাখলেন, তখন তাঁর চোখ খুলে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, যে ভ্রাতৃত্বের কথা তিনি কিতাবে পড়েছেন, হজ্জের ময়দান তার এক মূর্ত বাস্তবতা। তিনি দেখেছিলেন যে, আমেরিকায় যে ভ্রাতৃত্বের জন্য তাঁরা লড়াই করছেন, ইসলাম তা চৌদ্দশ বছর আগেই হজ্জের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁর বন্ধুদের কাছে লিখেছিলেন, 'I have never before seen sincere and true brotherhood practiced by all colors together, irrespective of their color.' 'আমি আমার জীবনে আগে কখনো এমন অকৃত্রিম ও সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব দেখিনি, যেখানে সব রঙের মানুষ একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে' *(The Autobiography of Malcolm X)*। হজ্জের এই শিক্ষা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, তাওহীদ কেবল পরকালে মুক্তির পথ নয়, বরং ইহকালে মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠারও চূড়ান্ত সনদ।

মহাকবি ইকবালের চিন্তায় হজ্জ হ'ল উম্মাহর শক্তির উৎস। তিনি মনে করতেন, হজ্জ মুসলিমদের শিখিয়ে দেয় যে, তাদের আসল গন্তব্য কোন ভৌগোলিক সীমানা নয়, বরং মক্কা। হজ্জ আমাদের 'শিকড়' বা উৎসের সাথে যুক্ত করে, যা আধুনিক যুগের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে আমাদের রক্ষা করে। তাঁর 'আসরারে খুদী'-তে তিনি কা'বাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,

تو ہمہ سرمایۂ وما ہمہ پا + از تو داریم ایں ہمہ عزو وقار از تو داریم

(তুমিই আমাদের মস্তক, আমরা তোমার পদতলে; আমাদের সকল সম্মান ও গাম্ভীর্য তোমার (কাবার) সাথেই যুক্ত)। অর্থাৎ কাবার সাথে বিচ্ছেদ মানেই উম্মাহর ধ্বংস। হজ্জ আমাদের সেই উৎসের সাথে পুনর্মিলন ঘটায়।

তিনি আরো বলেন, হজের মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ (Territorial Nationalism) ভুলে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সাথে যুক্ত হয়। তার দৃষ্টিতে হজ্জ হ'ল মুসলিম উম্মাহর বার্ষিক Renewal বা নবায়ন, যা তাদের হৃদয়কে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ করে। 'খিজরে রাহ' কবিতায় তিনি হজ্জের বিশাল সমাবেশের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন এভাবে–

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تابخاکِ کاشغر

(নীলনদ থেকে শুরু করে কাশগরের সীমান্ত পর্যন্ত–সব

২. *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন পৃ.* ১/২৬৩।

মুসলমানকে এক হতে হবে এই 'হারম' বা কাবার পাহারাদারীর জন্য)। এখানে তিনি বুঝিয়েছেন যে, মক্কাকে কেন্দ্র করেই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শক্তির উত্থান সম্ভব।

তিনি হজ্জকে দেখেছেন উম্মাহর জাগরণের প্রতীক হিসাবে যেখানে বিশ্বের সকল মুসলিম এক হয়ে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ায়, আর তাদের হৃদয়ে জেগে ওঠে এক অখণ্ড ঐক্যের স্বপ্ন। তিনি বলেন,

قافلہ ہو جائے گا پھر گرم سفر + نعرہ-ی تکبیر سے گونجے گا دشت و در

(এই কাফেলা আবারও তার গন্তব্যের পথে তীব্রভাবে যাত্রা শুরু করবে; আর 'নারায়ে তাকবীর'-এর ধ্বনিতে মরুপ্রান্তর ও পাহাড়-পর্বত কেঁপে উঠবে)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর দৃষ্টিতে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রয়েছে এক অব্যক্ত সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধের পাঠ। এতে রয়েছে পূণ্যবানদের স্মৃতি, ভক্তি এবং সম্মিলিত শক্তির এক অপূর্ব সমন্বয়। এর মূল বৈশিষ্ট্য তিনটি– (১) এটি ইতিহাসের জীবন্ত পাঠ। কেননা হজ্জের মাধ্যমে নবী, ছিদ্দীক ও ছালেহীনদের স্মৃতিধন্য পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁদের আদর্শকে স্মরণ করা যায়, যা মুমিনকে তাঁর শেকড় বা ঐতিহ্যের সাথে জুড়ে দেয়। (২) হজ্জে রয়েছে সম্মিলিত আকুতির শক্তি। যখন পৃথিবীর চারপ্রান্ত থেকে আসা অগণিত ছালেহীন বা নেককার মানুষের মনের বাসনা, তওবা এবং ক্রন্দন একই সময়ে ও একই স্থানে মিলিত হয়, তখন সেখানে সম্মিলিত ভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ যেমন ঘটে, তেমনই মহান আল্লাহ্র রহমতের জোয়ার আসা অবধারিত হয়ে পড়ে। এই ঐক্যবদ্ধ রোনাজারীই শয়তানকে সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত ও পরাজিত করে। হাদীছের বর্ণনায় এসেছে যে, 'আরাফার দিন ব্যতীত আর এমন কোন দিন নেই, যেদিন শয়তান এত বেশী অপমানিত, এত ছোট এবং এত ক্রুদ্ধ হয়'।[৩] (৩) হজ্জের মাধ্যমে পবিত্র নিদর্শন ও ত্যাগের পরম্পরা দেখে হাজীরা উদ্বুদ্ধ হয়। তাছাড়া প্রতিটি জাতির মধ্যেই পবিত্র স্থান বা নিদর্শনের প্রতি অনুরাগের একটি সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। হজ্জের মাধ্যমে মানুষ সেই প্রাচীন ইব্রাহিমী ত্যাগের রীতিগুলো পালন করে মূলত আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সেই মহান পথেরই অনুসরণ করে।[৪]

৫. ইসলামী সমাজ গঠন :

হজ্জের সামাজিক গুরুত্বও অপরিসীম। এটি কেবল কাবা দর্শন নয়, বরং মানুষের হৃদয়ে এক নতুন কা'বা গড়ার সংগ্রাম। ছাফা-মারওয়ার সেই ক্লান্তি আর ইব্রাহীমী ত্যাগের উদ্দীপনা একজন হাজীকে বুঝিয়ে দেয় যে, সামাজিক জীবনের প্রতিটি সংকট আল্লাহ্র রহমতের এক একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নামই হ'ল 'ইসলামী সমাজ গঠন', যেখানে ব্যক্তিগত শুদ্ধি আর সামাজিক মুক্তি একই সূত্রে গাঁথা।

এভাবে হজ্জ একটি আদর্শিক সমাজ বিনির্মাণেরও বাস্তব মহড়া। হজ্জের প্রতিটি রুকন আমাদের এক মহান প্রশিক্ষণ শিবিরের সদস্য হিসাবে দীক্ষিত করে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইব্রাহীম (আ.)-এর সেই অজেয় ত্যাগ ও আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আনুগত্যের স্মৃতি। এতে সমাজগঠনের যে সকল উপাদান দৃশ্যমান হয়, তা নিম্নরূপ– (১) হাজীগণ যখন মিনায় পাথর মারেন বা পশু কুরবানী করেন, তখন তাঁরা মূলত নিজের ভেতরকার ক্ষুদ্র স্বার্থ, অহংকার এবং পশুবৃত্তিকে বিসর্জন দেওয়ার শপথ নেন। একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ব্যক্তির এই 'নফসের কুরবানী' অত্যন্ত যরূরী। হজ্জের এই শিক্ষা হাজীদের শেখায় কীভাবে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে উৎসর্গ করতে হয়। (২) ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে হাজীদের দৌড়ানো কেবল একটি প্রাচীন স্মৃতিচারণ নয়। এটি মূলত 'সামাজিক প্রতিকূলতায় অবিচল থাকার প্রশিক্ষণ'। হাজেরা (আ.)-এর সেই নির্জন মরুপ্রান্তরে পানির জন্য ব্যাকুল ছোটাছুটি আমাদের শেখায় একটি আদর্শ সমাজ গড়তে হলে কেবল ঘরে বসে মনস্কামনা পোষণ করা বা দো'আ করলে হবে না কিংবা হতাশা নিয়ে হিম্মত হারালে চলবে না; বরং প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মাঝেও ধৈর্যের সাথে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (৩) হাজেরা (আ.)-এর সেই অসীম সন্তানবাৎসল্য ও আল্লাহ্র প্রতি ভরসাই আজ 'যমযম' নামক অফুরন্ত নে'মতের উৎস। এটি আমাদের বার্তা দেয় যে, যদি একটি সমাজ সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে এবং সৎ উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করে, তবে আল্লাহ সেই মরুপ্রান্তর থেকেও সমৃদ্ধির ধারা বইয়ে দিতে পারেন। এখানে আত্মা শেখে সামাজিক মানুষের ত্যাগ ও বিশ্বাসের গভীরতা। এভাবে হজ্জ হয়ে ওঠে কল্যাণমুখী ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের এক মৌলিক হাতিয়ারে। (৪) হজ্জের সময় যখন সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই একই কাতারে দাঁড়ায়, তখন কৃত্রিম সামাজিক উঁচু-নিচু দেয়ালগুলো ভেঙে পড়ে। এই সাম্যই হ'ল ইসলামী সমাজ গঠনের মূল হাতিয়ার। হজ্জের এই আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষকে স্বার্থপরতা থেকে বের করে এনে 'পরোপকারী' ও 'সমাজ সচেতন' এক অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করে।

উপসংহার :

হজ্জ মুসলিম জীবনে এক অনন্য প্রভাববিস্তারকারী ইবাদত, যার ফলাফল মুমিনরা সারা জীবনভর অনুভব করেন। তবে হজ্জের এই আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সুফল পেতে হলে এবং হজ্জকে 'হজ্জে মাবরূর' বা কবুল হজ্জের মর্যাদায় উন্নীত করতে চাইলে তিনটি বিষয়ে পরিশুদ্ধিতা একান্ত অপরিহার্য।

১. ইখলাছ বা নিয়তের পরিশুদ্ধিতা : হজ্জের প্রতিটি কদম হ'তে হবে রিয়ামুক্ত এবং কেবলই মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত। সামাজিক মর্যাদা লাভ, নামের আগে 'হাজী' লকব লাগানো, লোকদেখানো মানসিকতা বা হজ্জ সফরকে পারিবারিক 'ট্যুর' কিংবা আনন্দভ্রমণ বানিয়ে ফেলা হজ্জের মূল আত্মাকেই ধ্বংস করে দেয়। এজন্য যে কোন ইবাদতের মত হজ্জের ক্ষেত্রেও নিয়তের শুদ্ধতার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

৩. *মুওয়াত্তা, সনদ মুরসাল যঈফ, তবে অর্থগতভাবে ছহীহ, যঈফ তারগীব ওয়া তারহীব হা/৬৭৯।*
৪. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৪২।*

নতুবা তা ইবাদত হিসাবেই আল্লাহ্র কাছে গণ্য হবে না।

২. মানহাজের পরিশুদ্ধিতা : হজ্জ পালনকারীর আক্বীদা হ'তে হবে শিরকমুক্ত এবং হজ্জ আদায়ের নিয়ম-কানূন হ'তে হবে সম্পূর্ণ সুন্নাহসম্মত। ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আত বা নিজের মনগড়া পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। বরং রাসুলুল্লাহ (ছা.)-এর প্রদর্শিত সুন্নাত এবং সালাফদের বুঝ বা মানহাজ অনুযায়ী হজ্জের প্রতিটি কর্ম সম্পন্ন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ রাসূল (ছা.) বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও *(নাসাঈ হা/৩০৬২)*।' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক না হলে সেই ইবাদত আল্লাহ্র কাছে কবুল হয় না।

৩. রিযিকের পরিশুদ্ধিতা : হজ্জ সফরের অর্থ হতে হবে হালালভাবে উপার্জিত। কেননা হারাম রিযিকে লালিত শরীর আর হারাম টাকার পোষাক পরে লাব্বাইক ধ্বনি আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। হালাল রিযিকের পবিত্রতা হাজীকে সেই নূর দান করে, যা তাকে হজ্জের পর একটি কলুষমুক্ত ও আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করে। নতুবা তার হজ্জ 'মাবরূর' হয় না এবং তার পরবর্তী জীবনে হজ্জ কোন প্রভাবও ফেলে না। বরং উল্টোটাই ঘটে। ফলে হজ্জের আধ্যাত্মিক অর্জন থেকে সে দূর্ভাগ্যজনকভাবে বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, হজ্জ হ'ল তাওহীদ ও তাকওয়ার এক অসাধারণ প্রশিক্ষণ এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের এক অবিনশ্বর হাতিয়ার। যদি নিয়ত এবং মালের পরিশুদ্ধিতার সাথে ছাফা-মারওয়ার সেই ক্লান্তি আর আরাফাতের আকুতি একজন মুমিনের জীবনে মিশে যায়, তখনই সে লাভ করে একটি নিষ্পাপ শুভ্র জীবন। হজ্জের সেই পবিত্র নূর তখন কেবল মক্কার প্রান্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং হাজীদের মাধ্যমে সারা বিশ্বের প্রতিটি জনপদে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হজ্জ পালনের মহা সৌভাগ্য দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমাদের জীবনকে হেদায়াতের স্নিগ্ধ পবিত্র আলোয় সুশোভিত করুন। আমীন!

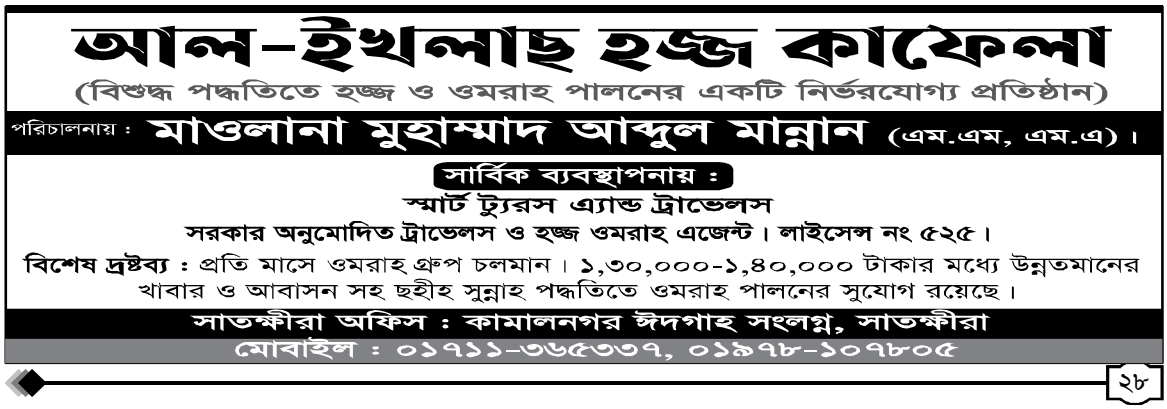

তাওহীদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা : বিশ্বাস ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক*

প্রচলিত জড়বাদী বা পুঁজিবাদী দর্শনে অর্থনীতি মানেই কেবল সম্পদ আহরণ এবং আয়-ব্যয়ের এক যান্ত্রিক হিসাব-নিকাশ। কিন্তু ইসলামের সুমহান ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানে মানবজীবনের প্রতিটি দিক যেমন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সবকিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। একজন মুমিনের অর্থনৈতিক জীবন শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা নয়। এটি মহান রবের প্রতি নিঃশর্ত দাসত্ব এবং সৃষ্টির প্রতি গভীর দায়িত্ববোধের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। অর্থনৈতিক জীবনের এই তাৎপর্য বোঝাতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، 'আর আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। এই আয়াতে ব্যবহৃত يَعْبُدُونِ (তারা ইবাদত বা দাসত্ব করবে) শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ। ইবাদত কেবল নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষ করে হালাল উপার্জন, সঠিক পথে ব্যয় এবং পারস্পরিক লেনদেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ 'মু'আমালাত' বা অর্থনৈতিক আচরণেও এই দাসত্বের প্রতিফলন ঘটা অপরিহার্য। যখন একজন মুমিন আল্লাহ্‌র বিধান মেনে সততার সাথে ব্যবসা করেন, শ্রম দেন বা পরিবারকে হালাল রিযিক খাওয়ানোর চেষ্টা করেন তখন তাঁর সেই কর্মটিও ইবাদতে রূপান্তরিত হয়।

সমকালীন অর্থনৈতিক সংকট ও ইসলামী সমাধানের প্রাসঙ্গিকতা : বর্তমান বিশ্ব এক চরম অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও বৈষম্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক পুঁজিবাদী ও সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা মানুষকে অবাধ প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখালেও, বাস্তবে তা জন্ম দিয়েছে লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং সম্পদের চরম অসম বণ্টন। অক্সফাম (Oxfam) বা অন্যান্য বৈশ্বিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে আজ বাকী ৯৯ শতাংশ মানুষের চেয়ে বেশী সম্পদ কুক্ষিগত।[১] ঋণনির্ভর অর্থনীতি আজ বহু দেশকে দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। মানবসৃষ্ট এসব অর্থনৈতিক মতবাদ যখন বৈশ্বিক সংকট সমাধানে চরমভাবে ব্যর্থ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান যখন প্রতিনিয়ত মুখ থুবড়ে পড়ছে ঠিক তখনই একটি নৈতিক, ইনছাফভিত্তিক এবং টেকসই বিকল্প হিসাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা : আমরা ব্যক্তিগত ইবাদতে আল্লাহকে 'ইলাহ' বা উপাস্য হিসাবে মেনে নিলেও, অর্থনৈতিক জীবনে চরমভাবে পশ্চিমা ভোগবাদী ও সূদভিত্তিক ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে পড়েছি। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনীতিতে উন্নয়নের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে জিডিপি (GDP) ও জিএনপি (GNP)-কে অন্ধভাবে গ্রহণ করতে গিয়ে আমরা হালাল-হারামের মৌলিক সীমারেখাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। পুঁজিবাদ আমাদের শিখিয়েছে বস্তুগত প্রবৃদ্ধিই সফলতার মাপকাঠি, অথচ ইসলাম শেখায় সম্পদের পবিত্রতা ও ইনছাফ। যখন অর্থ উপার্জনের মোহ ও প্রতিযোগিতায় মানুষ তার স্রষ্টাকে ভুলে যায়, তখন সেই সম্পদই তার জন্য রহমতের পরিবর্তে ভয়াবহ 'ফিতনা' হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত নীতিহীন অর্থ উপার্জনের নেশা মানুষকে আত্মিক অন্ধত্বের দিকে ঠেলে দেয়। এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। যারা এরূপ করবে (অর্থাৎ উদাসীন হবে), তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*। একটি ইনছাফভিত্তিক ও শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামী অর্থনীতি বেশ কিছু মৌলিক নীতি অনুসরণ করে। নিম্নে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অনুসৃত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা তুলে ধরা হ'ল :

১. হালাল-হারাম বিধিলিপি : ইসলামে উপার্জনের পরিমাণের চেয়ে এর উৎসের পবিত্রতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসা, চাকরি, কৃষি বা অন্য যেকোন পেশায় উপার্জনের পথটি হ'তে হবে সম্পূর্ণ হালাল ও ন্যায়সঙ্গত। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। অপরদিকে হারাম উপার্জন মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটায় এবং ইবাদতকে বিনষ্ট করে দেয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، 'হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

মূলত যে ব্যক্তি তার উপার্জনের উৎস যাচাই করে না সে নিজের দ্বীনকেই এক চরম ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। মানুষের আমল বরবাদ হওয়ার এবং সমাজে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল হারাম ও অবৈধ উপায়ে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সতর্ক করে বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ

*. বিএসএস (সম্মান), এমএস, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১. প্রথম আলো, ১৭ই জানুয়ারী ২০২৩।

করোনা পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সততা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা হ'ল সবচেয়ে বড় মূলধন। যাঁরা সততার সাথে ব্যবসা বা অর্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনা করেন, তাঁদের মর্যাদার বিষয়ে রাসূল (ছা.) সুসংবাদ দিয়েছেন, 'সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী ক্বিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে'।[২]

অপরপক্ষে, হারাম উপার্জনের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত সতর্কবাণী হ'ল, 'ঐ দেহ জান্নাতে যাবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে'।[৩] এ কারণেই পূর্ববর্তী সালাফগণ হারাম থেকে বেঁচে থাকাকে হাযার রাক'আত নফল ছালাতের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

এ প্রসঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে কা'বাঘর পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশরা কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এই পবিত্র নির্মাণকাজে কোন অবৈধ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। শেষ পর্যন্ত হালাল অর্থের সংকুলান না হওয়ায় তারা কা'বার নির্মাণ অসম্পূর্ণ রেখেই কাজ বন্ধ করে দেয়। যা আজও কা'বার পাশে হিজর বা হাতীম হিসাবে পরিচিত। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হ'ল– যেখানে আল্লাহ্র ঘরের পবিত্র কাঠামোতে হারাম অর্থ অগ্রহণযোগ্য, সেখানে একজন মুমিনের রক্ত-মাংসে গড়া ইবাদতকারীর শরীরে হারাম উপার্জনের অনুপ্রবেশ কিভাবে বৈধ ক'তে পারে!

২. সূদের বিরুদ্ধ কঠোর সতর্কবার্তা ও বৈশ্বিক শোষণ : ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হ'ল সূদের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেখানে সূদের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে ইসলাম সূদকে মানবসমাজের সবচেয়ে বড় শোষক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সূদ ধনীকে বিনা পরিশ্রমে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আরও ধনী বানায়। পক্ষান্তরে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত ঋণগ্রহীতাকে সর্বস্বান্ত করে পথে বসায়। সূদী ঋণের বিষাক্ত জালে আবদ্ধ হয়ে কোন ব্যক্তি বা জাতি আজ অবধি প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তি বা ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছে এমন নযীর ইতিহাসে বিরল। এ কারণেই একটি শোষণমূলক সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এবং একটি কল্যাণকামী ইসলামী রাষ্ট্রপ্রকল্প কখনোই একসাথে চলতে পারে না। সূদের এই ভয়াবহ শোষণের পথ রুদ্ধ করতে মহান আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। যারা এর পরেও সূদী কারবারে জড়িত থাকবে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সবচেয়ে কঠোর এবং ভয়ংকর এক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আল-কুরআনে, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ 'অতঃপর যদি তোমরা তা না কর, তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*।

শুধু ইসলাম নয়, ঐতিহাসিকভাবে প্রতিটি আসমানী গ্রন্থ এবং বহু দার্শনিক মতবাদেও সূদকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ সেন্ট থমাস আকুইনাস (Saint Thomas Aquinas) বলেছিলেন, 'সূদ নেওয়া প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী। কারণ অর্থ নিজে নিজে বৃদ্ধি পায় না'। এক্ষেত্রে বাইবেলের একটি উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, 'যাদের কাছ থেকে ফেরত পাওয়ার আশা করো, তাদের ঋণ দিলে তোমাদের কী কৃতিত্ব'? (লুক/Luke ৬:৩৪-৩৫)। এমনকি ইহুদী ধর্মেও (তাওরাতের বিধান অনুযায়ী) নিজেদের স্বজাতির মধ্যে সূদ দেওয়া-নেওয়াকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে চরম আক্ষেপের বিষয় হ'ল বর্তমানে যে চরম বৈষম্যমূলক ও সূদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গোটা মানবজাতিকে শোষণ করে চলেছে তার অন্যতম প্রধান রূপকার ও নিয়ন্ত্রক মূলত ইহুদী পুঁজিপতিরা।

৩. যাকাত, ছাদাক্বা ও ইনফাক : ইসলাম সম্পদকে কেবল ব্যক্তিগত মালিকানা বা ভোগের বস্তু হিসাবে দেখে না বরং এটি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া একটি পবিত্র আমানত। এই আমানতের যথাযথ ব্যবহার করাই মানুষের দায়িত্ব। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত কেবল ঐচ্ছিক কোন দাতব্য প্রথা (Charity) বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মতো কোন সাধারণ কর (Tax) নয়; এটি একটি অবশ্য পালনীয় ইবাদত এবং সম্পদের পবিত্রতা নিশ্চিত করা ধনীদের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। মূলত পুঁজিবাদী সূদ-এর শোষক চরিত্রের ঠিক বিপরীত দর্শন বা বিকল্প মডেল (Alternative Thesis) হিসাবেই ইসলাম যাকাতভিত্তিক এই কল্যাণমুখী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেছে। ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদের অধিকার হিসাবে প্রদান করে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার এক যুগান্তকারী মহাপরিকল্পনা হ'ল যাকাত।

সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের অধিকার নিশ্চিত করতে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، 'তাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের অধিকার' *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যাকাত দ্বারা দরিদ্রদের প্রতি কোন করুণা নয় বরং এটি গরিবের ন্যায্য পাওনা, যা বুঝিয়ে দেওয়া ধনীদের নৈতিক ও দ্বীনি দায়িত্ব।

যাকাতের পাশাপাশি ছাদাক্বাহ এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় (ইনফাক) মানুষের আত্মাকে কৃপণতার ব্যাধি থেকে পরিশুদ্ধ করে এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। আধুনিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত ও ছাদাক্বাহ সমাজে অর্থের প্রবাহ (Velocity of Money) বহুগুণে বৃদ্ধি করে। অর্থ যখন ধনীদের কুক্ষিগত না থেকে সমাজের নিম্নস্তরে প্রবাহিত হয় তখন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, সামগ্রিক চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (Economic Growth) সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

২. *তিরমিযী হা/১২০৯, মিশকাত হা/২৭৯৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৮২।*
৩. *বায়হাক্বী-শু'আব, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।*

সম্পদের এই নিরাপদ প্রবাহের বদৌলতেই খোলাফায়ে রাশেদা এবং ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.)-এর শাসনামলে আরব ভূখণ্ডে এমন এক বিস্ময়কর অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটেছিল যে, সেসময় যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতো অভাবী মানুষও খুঁজে পাওয়া যেত না। অথচ মাত্র কয়েক দশক আগেও সেই একই অঞ্চল ছিল চরম দারিদ্র্য ও অনাহারে পীড়িত।

৪. সম্পদের সুষম বণ্টন : সম্পদের সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম একটি মৌলিক নির্দেশনা। যে সমাজে দরিদ্র, ইয়াতীম, মিসকীন ও মযলূমের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত হয় না সেখানে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটলেও প্রকৃত অর্থে কোন টেকসই ও মানবিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকেও কেবল ক্রয়ক্ষমতার মানদণ্ডে বিচার করা হয়। এই সিস্টেমে কেবল সেই ইয়াতীমই মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পায়, যার পিতা অঢেল সম্পদ রেখে গেছেন। কেবল সেই রোগীই উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পায় যার বিপুল অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ যার পকেটে টাকা আছে কেবল সে-ই ভোক্তা হিসাবে তার চাহিদা পূরণ করতে পারে। আর যার সামর্থ্য নেই সে নিষ্ঠুর বাজার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বাইরে ছিটকে পড়ে। পুঁজিবাদের এই নির্মম কাঠামোতে সবার চূড়ান্ত লক্ষ্য (Ultimate Goal) একটাই 'প্রফিট অ্যান্ড প্রফিট' বা শুধুই অন্ধ মুনাফা অর্জন।

পক্ষান্তরে ইসলাম এমন এক মানবিক অর্থনীতির রূপরেখা দেয় যেখানে মুনাফার চেয়ে ইনছাফকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন ও অশ্লীলতা, অন্যায় ও অবাধ্যতা হ'তে নিষেধ করেন' *(নাহল ১৬/৯০)*। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একটি শক্তিশালী ও কল্যাণকামী অর্থনৈতিক বুনিয়াদের তিনটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন- আদল (ন্যায়বিচার বা ইনছাফ), ইহসান (কল্যাণকামিতা বা ছাড় দেওয়া) এবং নিকটাত্মীয়ের হক আদায়। ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না যে সম্পদ কেবল সমাজের গুটি কয়েক ধনকুবের বা এলিট শ্রেণীর সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকুক। সমাজে সম্পদের চক্রাকার ও সুষম প্রবাহ নিশ্চিত করার চূড়ান্ত দর্শন বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ 'যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' *(হাশর ৫৯/৭)*। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত, মীরাছ (উত্তরাধিকার আইন), ওয়াকফ এবং ছাদাক্বাহর মতো অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। যা সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্যের পাহাড় ভেঙে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলে।

৫. সততা, স্বচ্ছতা ও চুক্তির গুরুত্ব : ইসলামে অর্থনৈতিক লেনদেনে স্বচ্ছতা এবং লিখিত দলীলের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা, চাকরি বা যেকোন মাধ্যমে উপার্জনের ক্ষেত্রে মুমিনের প্রধান দায়িত্ব হ'ল সততা বজায় রাখা। ওযনে কারচুপির বিরুদ্ধে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১)*। প্রতারণা বা অসততা কেবল সামাজিক অপরাধ। এটি সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে পরকালীন জবাবদিহিতার বিষয়। আধুনিক অর্থনীতিতে যাকে 'Information Asymmetry' বা তথ্যের অসমতা বলা হয়, ইসলাম তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। লেনদেনে কোন প্রকার অস্পষ্টতা, গোপনীয় প্রতারণা বা তথ্য লুকানো সম্পূর্ণ অবৈধ। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, ততক্ষণ তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার স্বাধীনতা থাকবে। যদি তারা উভয়েই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহ'লে তাদের পারস্পরিক এ ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং পণ্যের দোষ গোপন করে তাহ'লে তাদের এ ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত উঠিয়ে নেয়া হবে'।[৪] বোঝা যাচ্ছে, স্বচ্ছতা শুধু ভালো গুণ নয়, এটি রিযিকে বরকত লাভের অন্যতম শর্ত। তাই পণ্যের ত্রুটি গোপন করা বা চটকদার প্রচারণা ইসলামী অর্থনীতির পরিপন্থী।

অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম প্রতিটি চুক্তিকে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে বিবেচনা করে। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। ভবিষ্যতের বিরোধ এড়াতে কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ লেনদেন করবে, তা লিখে রাখো' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। চুক্তি শুধু দুনিয়াবী সমঝোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আখেরাতেও এর হিসাব দিতে হবে। এমনকি রাসূল (ছাঃ) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মুনাফিকীর লক্ষণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

সততা, স্বচ্ছতা ও চুক্তি–এই তিনটি গুণ একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সহজ সমীকরণে বলা যায় সততা পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি করে, স্বচ্ছতা লেনদেনে বরকত আনে এবং চুক্তি পালন সমাজে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান বিশ্বে যেখানে প্রতারণা ও ভঙ্গুর বিশ্বাস অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করছে, সেখানে এই নীতিগুলো এক টেকসই সমাধান।

৬. অপচয় ও কৃপণতার নিষেধাজ্ঞা : ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র 'আমানত' হিসাবে গণ্য করা হয়। এই আমানতের সঠিক ব্যবহারের জন্য একজন ইসলামী ভোক্তার প্রধান দায়িত্ব হ'ল নিজের ও পরিবারের বৈধ প্রয়োজন মেটানো, সমাজের অধিকার আদায় করা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে ব্যয় করা। তবে এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে একটি সুনির্দিষ্ট ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা বজায় রাখতে হবে।

---

৪. বুখারী হা/২০৭৯; মুসলিম হা/১৫৩২।

অপচয় হ'ল সম্পদের অপব্যবহার। এর ফলে ব্যক্তির নিজের যেমন ক্ষতি হয় তেমনি সমাজে সম্পদের কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়, দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। এ কারণেই অপচয়কারীদের কঠোর ভর্ৎসনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، 'নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনু ইসরাঈল ১৭/২৭)*। অন্যদিকে কৃপণতা হ'ল আল্লাহ্র দেওয়া আমানতের একপ্রকার খিয়ানত। কৃপণতা মানুষের হৃদয়কে সংকীর্ণ করে এবং সামাজিক সহমর্মিতাকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কৃপণতার সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর দিক হ'ল এটি বাজারে অর্থের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে অর্থনীতিতে স্থবিরতা নিয়ে আসে। কৃপণদের সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، 'আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর' *(আলে-ইমরান ৩/১৮০)*।

এই দুই প্রান্তিকতার (অপচয় ও কৃপণতা) মাঝে ইসলাম এক টেকসই ও কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা দিয়েছে। আর তা হ'ল 'মধ্যমপন্থা'। চরম ভোগবাদ এবং কৃপণতার বিপরীতে একজন প্রকৃত মুমিনের ব্যয়নীতির পরিচয় তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا– 'আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করেনা বা কৃপণতা করেনা। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। মূলত, এই ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থাই হ'ল ব্যক্তি ও সমাজের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর এবং একটি স্থিতিশীল অর্থনীতি গড়ার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

৭. ঘুষ, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি : প্রবাদ আছে, 'Money is brighter than sunshine and sweeter than honey' 'অর্থ সূর্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল এবং মধুর চেয়েও সুমিষ্ট'। অর্থের এই সুমিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে অনেকেই আজ নৈতিকতার গণ্ডি পেরিয়ে ঘুষ, দুর্নীতি এবং চাঁদাবাজির মতো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। অনৈতিক কোন কর্মকাণ্ড কখনোই বৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ঘুষ, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি- এই তিনটিই অত্যন্ত গুরুতর এবং সমাজ বিধ্বংসী অপরাধ। ঘুষ সম্পূর্ণ হারাম এবং অভিশপ্ত কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষের দালাল সকলের উপর লা'নত করেছেন'।[৫] দুর্নীতি হ'ল আমানতের চরম খিয়ানত। দুর্নীতির মূল উৎপাটনে দায়িত্বশীলতার চূড়ান্ত গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাসূল (ছা.) ইরশাদ করেন, 'সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে'।[৬] অপরদিকে চাঁদাবাজি এমন এক ভয়ংকর যুলুম, যার মাধ্যমে সরাসরি বান্দার হক নষ্ট করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوْا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'কারো উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ এ অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকার রূপেই দেখা দিবে'।[৭] আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে চাঁদাবাজিকে যেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার এক অশুভ চেষ্টা চলছে। এ যেন নতুন বোতলে পুরোনো মদেরই নির্যাস! দেশে শরী'আ আইন বলবৎ থাকলে নিঃসন্দেহে বহু চাঁদাবাজ এবং দুর্নীতির বরপুত্রদের হাত কাটা যেতো। সেই নিরিখে শরী'আ আইনের বিরোধিতা করার কথা ছিল চোর, ডাকাত, ধর্ষক এবং দুর্নীতিবাজদের। কিন্তু বাস্তবে তার বিরোধিতা করছে দেশীয় এলিট শ্রেণী। মূলত এখানকার সরল সমীকরণটি হ'ল– নিজেদের অপরাধের দীর্ঘ ফিরিস্তি ঢেকে রাখতেই কেবল শরী'আহ আইন ব্যতিরেকে তারা ব্রিটিশ কমন আইনের প্রতি নিঃসঙ্কোচ অবনমন প্রদর্শন করে। কেননা পুঁজিবাদপীড়িত থার্ড ওয়ার্ল্ডের দেশগুলোর একটা বড় সমস্যা হ'ল এখানে অর্থনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হয় এবং রাজনৈতিক সমস্যার অর্থনৈতিক সমাধান খোঁজা হয়। ফলত মাকড়সার জাল সদৃশ আইনী ফাঁকফোকরে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ আটকাতে পারলেও রাঘব বোয়ালরা ঠিকই পার পেয়ে যায়। সেজন্যে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব মেনে না নিলে অপরাধের দুষ্ট চক্র থেকে বের হওয়া কখনোই সম্ভব না।

উপসংহার : ইসলাম মহান আল্লাহ্র দেওয়া এক সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যা অনুসরণ করলে মানবজাতি প্রকৃত কল্যাণ লাভ করে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম এমন এক অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যা ক্রীতদাস থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু–সবার জন্য সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করেছিল। ইসলামী অর্থনীতি একটি নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। যেখানে উপার্জন, ব্যয় ও লেনদেন–সবকিছুই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

আমাদের বর্তমান সংকট হ'ল আমরা মুখে কালিমার স্বীকৃতি দিলেও কর্মজীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ থেকে দূরে সরে গেছি। অথচ ইসলামে দ্বীন ও দুনিয়া অভিন্ন এবং দুনিয়া হ'ল আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। অল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা প্রতিটি হালাল কাজই ইবাদত। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মুমিনরা ছালাত শেষে অল্লাহ্র দেওয়া রিযিক তালাশে যমীনে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের অর্থনৈতিক জীবনও হ'তে হবে পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহ্র দাসত্বপূর্ণ। পরিশেষে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে- আসমানে যিনি আমাদের রব, যমীনের সকল বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তিনিই আমাদের একমাত্র রব।

---

৫. আহমাদ, তিরমিযী, বায়হাক্বী মিশকাত হা/৩৭৫৩-৫৫, সনদ ছহীহ।

৬. বুখারী হা/৮৯৩।

৭. মুসলিম হা/২৫৭৮।

প্রবন্ধ রচনা : কলাকৌশল ও চর্চা

-সারওয়ার মিছবাহ

শিক্ষাঙ্গন বিভাগ থেকে আমরা শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে থাকি। আমরা সেই বিষয়গুলো আলোচনা করি যেগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন। এই বিভাগে কখনো আমরা শিক্ষার বিভিন্ন সংস্কার নিয়েও আলোচনা করেছি। এর মানেই আমরা শিক্ষাবীদ নই। আমরা মনে করি, আমরা যতুকুই জানি তা আমাদের মাঝে চর্চিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের লেখালেখি শেখানোও সেই প্রয়াস থেকেই। কিভাবে লেখতে হয়, এই বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার মানেই যে আমরা অনেক বড় লেখক, এমন নয়। আমরা চাই, আমাদের যে শিক্ষার্থীরা লেখতে চায় তারা যেন প্রাথমিক পরামর্শের অভাবে না ভোগে। মোটামুটি একটা দিক নির্দেশনা যেন তারা এখান থেকে পায়। গত সংখ্যায় আমরা রোজনামচা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এই সংখ্যায় প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

লেখার জগতে যে কোন বিষয়কে পূর্ণরূপে উপস্থাপন করার সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম হ'ল প্রবন্ধ। কলমী সৈনিক হ'তে চাইলে প্রবন্ধ চর্চার কোন বিকল্প নেই। প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে একজন লেখকের যতটুকু চিন্তার বিকাশ ঘটে তা গল্প বা কবিতা ইত্যাদি লিখার মাধ্যমে ঘটে না। আবার প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে পাঠকের জ্ঞান যতটা সমৃদ্ধ হয়, অন্য কোন বিষয় পাঠে তা হয় না। এজন্য আমরা শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ লেখার জন্য উৎসাহিত করি। প্রবন্ধ লেখা তেমন কঠিন বিষয়ও নয়। একটু যত্নের সাথে মূল বিষয়গুলো খেয়াল করলেই একজন রোজনামচার লেখক প্রবন্ধ লেখায় দক্ষ হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

প্রবন্ধ পরিচিতি : প্রবন্ধ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হ'ল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' বা 'শ্রেষ্ঠ বাঁধন'। অর্থাৎ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর তথ্য ও যুক্তিনির্ভর সুবিন্যস্ত গদ্য রচনাই হ'ল প্রবন্ধ। যদি আরো সহজ করে বলি তবে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজস্ব চিন্তা, মতামত ও বিভিন্ন তথ্য বিস্তারিতভাবে গুছিয়ে লেখাকে প্রবন্ধ বলে। আশাকরি, প্রবন্ধ কাকে বলে তা স্পষ্ট হয়েছে। এই প্রবন্ধের আবার অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। আমরা প্রথম ধাপেই সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা এখানে প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানের প্রবন্ধ লেখা শিখব।

প্রবন্ধের গঠন : প্রবন্ধ লেখতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে, প্রবন্ধ গঠন করে কিভাবে, কি কি লেখতে হয় ইত্যাদি। একটি সার্থক প্রবন্ধের মূলত তিনটি অংশ থাকে। শিরোনামের পরেই যে কথাগুলো বলা হয় তাকে আমরা 'ভূমিকা' বলি। এখন প্রশ্ন আসে, ভূমিকায় কি লিখা হবে। এখানে সাধারণত মূল বিষয়ের সাথে পাঠকের পরিচয় করানো হয়। সামনে যে আলোচনা হ'তে যাচ্ছে তার প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়। আবার প্রবন্ধের বিষয় যদি প্রশ্নবিদ্ধ বা বিতর্কিত হয় তবে কখনো কখনো লেখক এখানে উদ্দিষ্ট বিষয়ে কলম ধরার কারণও বর্ণনা করেন। আলোচনা যেটাই হোক, ভূমিকা এমন হ'তে হবে যেন পাঠক ভূমিকা পড়ে পুরো লেখাটি পড়তে আগ্রহী হয়। এটা তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে।

ভূমিকার পরে আসে প্রবন্ধের মূল অংশ বা মূল আলোচনা। ভূমিকা লেখার পরে লক্ষ্য হবে, পাঠকের সামনে মূল আলোচনা উপস্থাপন করা। বিষয়বস্তুকে পাঠকের কাছে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে যতগুলো পয়েন্ট দরকার সেই পয়েন্টগুলোতে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ তৈরি করে এখানে আলোচনা করতে হয়। এজন্য শিরোনাম নির্বাচনের পরেই লেখা শুরু না করে যদি পয়েন্টগুলো আগে নোট করে নেওয়া হ'লে ভাল হবে। সবগুলো পয়েন্ট সামনে রেখে একটি একটি করে পয়েন্ট ধরে লেখা শুরু করতে হবে। যেমন একটি পয়েন্ট হ'ল, 'বর্তমান প্রেক্ষাপট'। সেখানে আলোচ্য বিষয়টি বর্তমান সমাজে কেমন মূল্যায়িত হচ্ছে তা তুলে ধরলে। এরপর একটি পয়েন্ট হ'ল, 'আমাদের করণীয়'। এখানে লেখকের নিজস্ব চিন্তা থেকে বিভিন্ন সমাধানগুলো প্রস্তাব করলে। উল্লেখিত পয়েন্টদু'টি যে কোন বিষয়বস্তুর সাথেই থাকতে পারে। যখন আলোচনা শেষ হবে তখন প্রবন্ধের উপসংহার লিখবে।

'উপসংহার' বা 'শেষ কথা' থাকবে মূল আলোচনা শেষে। এটা হ'ল পুরো আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। খেয়াল রাখতে হবে, এখানে নতুন কোন বিষয়ের অবতারণা না করে, সুন্দর ও পরিমার্জিত ভাষায় যেন ইতি টানা হয়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, যদি কোন নতুন বিষয় না লেখি তবে কি লেখব! সাধারণত এখানে প্রবন্ধের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হবে। অতিরিক্ত কোন নছীহত থাকলে সেটা উল্লেখ করা যায়। লেখার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়। পরিশেষে সকলের জন্য দো'আর মাধ্যমে লেখা শেষ করা যায়।

লেখার উৎস : এবার আসি প্রাথমিকদের মূল সমস্যা সমাধানে। প্রাথমিকদের সমস্যা হয় লেখার উৎস পেতে। তারা প্রশ্ন করে, লেখা কোথায় পাব? লেখা তো আসে না। লেখার বেশ কিছু উৎস আছে। তবে মৌলিক উৎস হ'ল, মস্তিষ্ক। একটি প্রবন্ধের খসড়া প্রথমত 'চিন্তা'য় আসে। তারপর লেখক সেটা লেখার পরে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত যুক্ত করে নিজের প্রবন্ধটি শক্তিশালী করেন। একটি পরিপূর্ণ চিন্তাকে যখন কুরআন-হাদীছ, ক্বওলুস সালাফ, যুক্তি-ইতিহাস ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা যায় তখনই সেটা পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ হয়।

এখন কোন প্রবন্ধের আইডিয়া আসতেই যদি মনে হয়, 'একটানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখব। তথ্য-উপাত্ত যুক্ত করে লেখা চালিয়ে যাবো'। তবে লেখা সুন্দর হবে না। কারণ একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তা নিয়ে লিখতে বসে যখন দু'লাইন লিখে কুরআনের আয়াত খুঁজতে গেলে, চার লাইন লেখার পরে হাদীছ খুঁজতে গেলে চিন্তা আর সমন্তরাল অবস্থায় থাকবে না। বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। ফলে লেখার পরে দেখবে, তথ্য তো অনেক জমা হয়েছে কিন্তু লেখা পড়তেই ভাল লাগছে না।

সুতরাং আগে চিন্তা অনুযায়ী প্রবন্ধটি লিখে নিতে হবে। এরপর তোমাকে উল্লেখিত বিষয়ের ওপর কুরআনের আয়াত, হাদীছ, ক্বওলুস সালাফ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এরপর সেগুলোকে স্থানভেদে সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে। তাহ'লে দেখবে, প্রবন্ধের ভাষা সমান্তরাল গতিতে এগুচ্ছে। তথ্য-উপাত্তগুলোও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

এবার আসি বিষয়বস্তু নির্ধারণে। অনেকেরই সমস্যা হ'ল, বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দিলে লেখতে পারে। তবে নিজে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে পারে না। আমরা মনে করি, একজন লেখক মাত্রই তার পকেটে সর্বদা ছোট্ট নোটপ্যাড এবং কলম থাকতে হবে। আর মস্তিষ্কে একটি চিন্তা সর্বদা গেঁথে রাখতে হবে, 'কোন বিষয়ে লেখা যায়'! তখন হাঠাৎই কোন কিছু দেখে মনে হবে, এই বিষয়ে একটি মানসম্মত প্রবন্ধ হ'তে পারে। সেই বিষয়টি সাথে সাথেই নোটে ছোট্ট করে লিখে নিতে হবে। আবার হঠাৎই কখনো কোন বিষয়ে সুন্দর একটি চিন্তা আসতে পারে। সেটাও সংক্ষেপে লিখে রাখতে হবে। কারণ পরবর্তীতে এগুলো আর মনে থাকবে না। এভাবে ধীরে ধীরে চর্চা শুরু করলে পরের রাস্তা নবীন নিজেই খুঁজে পাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রবন্ধ লেখায় যত সমস্যা : প্রবন্ধ লেখার শুরুর দিকে কয়েকটি সমস্যা খুব বেশী হয়, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল, মানসম্মত বিষয়বস্তু খুঁজে না পাওয়া। বিষয়বস্তু পেলেও সেই বিষয়ে লেখার মত কথা না আসা। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে এবং একজন ভাল লেখক হ'তে হ'লে আগে ভাল পাঠক হ'তে হবে। পড়ার পরিধি বাড়াতে হবে। প্রতিযশা লেখকদের প্রবন্ধ সংকলন সংগ্রহ করে খুঁটে খুঁটে দেখতে হবে, তারা কিভাবে প্রবন্ধের শিরোনাম নির্বাচন করেন। তারা কিভাবে পয়েন্ট গঠন করেন। সেভাবে নিজের লেখাতেও শিরোনাম ও পয়েন্ট তৈরি করতে হবে। একাধিক মাসিক পত্রিকা সংগ্রহে রাখতে হবে। সেখানে প্রতিমাসে কি ধরনের প্রবন্ধ আসছে সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যদি একা কেনা সম্ভব না হয় তবে গ্রুপ করে বা সাংগঠনিক উদ্যোগেও কেনা যেতে পারে।

আরেকটি সমস্যা হ'ল, একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে লিখতে বসলেও সেই বিষয়ে কথা আসছে না। কথা আসছে ভিন্ন কোন বিষয়ে। এঅবস্থায় করণীয় হ'ল, নতুন পাতা নিয়ে যে বিষয়ে কথা আসছে সেটাই লেখা শুরু করা। কিছুদূর লেখার পরে হয়তো এই বিষয়ে আর আসছে না। আরেকটি নতুন বিষয়ে আসছে। তখন নতুন আরেকটি পাতা নিয়ে সেটা লেখা শুরু কর। কারণ, পরবর্তীতে এমন হবে যে, লেখতে মন চাইবে, তবে বিষয় পাওয়া যাবে না। তখন এই অসম্পন্ন লেখাগুলো শেষ করবে।

এরপরের সমস্যা হ'ল, কিছুদূর লেখার পরে হীনমন্যতায় ভোগা, লেখা হয়ত ভাল হচ্ছে না! এই ওয়াসওয়াসা ভেতরে আসতে দেয়া যাবে না। সব সময় মনে রাখতে হবে, কোন লেখাই ভাল হয় না। সব লেখাকেই পরবর্তীতে ঘঁষে মেজে ভাল বানানো হয়। সুতরাং হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে কলম চালিয়ে যেতে হবে। প্রাথমিকভাবে দুইটা খাতা রাখা যেতে পারে। একটি রাফ খাতা, অপরটি পাকা খাতা। রাফ খাতায় যা মন চায় লিখে যেতে হবে। অতঃপর সেখান থেকে যতটুকু যেভাবে ভাললাগে, পাকা খাতায় তুলে সম্পাদনা করতে হবে। আশা করা যায়, বিষয়-বিড়ম্বনার সমস্যা থাকবে না।

এর পরের সমস্যা হ'ল, লেখার পরে সম্পাদনা করার মত ইচ্ছা, সময় ও রুচি কোনটাই হচ্ছে না। এটা স্বাভাবিক বিষয়। যে কোন বিষয় শিখতে গেলে অলসতা জেঁকে ধরবেই। তাই নিজের প্রতিদিনের রুটিনে 'সাহিত্য চর্চা' নামে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা সময় রাখতে হবে। প্রতিদিন লেখা হবে এমন নয়। কোনদিন লেখা হবে। কোনদিন আগের লেখা সম্পাদনা হবে। কোনদিন সাহিত্য পাঠ হবে। যে সকল মনীষির লেখার প্রতি আকর্ষণ ছিল বা লেখার মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন অথবা যাদের কলম বাতিলের মেরুদণ্ডে কাঁপন ধরিয়ে দিত এমন ব্যক্তিদের জীবনী ও লেখা অধ্যয়ন করতে হবে। এই অধ্যয়নের মাধ্যমে লেখার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এই ভালোবাসাই অসময়ে হাল ধরে রাখার শক্তি যোগাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রবন্ধের মান যাচাই : প্রবন্ধ লেখা শেষ করার পরে আসে মান যাচাইয়ের বিষয়। একজন লেখককে লেখার মান যাচাইয়ের কাজটি খুব ভালভাবে করতে হয়। এবিষয়ে তাকে খুব কঠোরতার পরিচয় দিতে হয়। যেমন, লেখার সমালোচনা গ্রহণ করতে হয়। সমালোচনা গ্রহণ করা যে কারো পক্ষেই খুব কঠিন কাজ। আবার কখনো লিখতে গিয়ে দেখা যাবে, একটি লেখা অনেক কষ্ট করে লেখার পরে সেখানে অর্ধেকই অপ্রাসঙ্গিক কথা চলে এসেছে। তখন সেই অপ্রাসঙ্গিক লেখাগুলো একটানে কেটে ফেলতে হয়। এখন যদি লেখার ওপরে মায়া দেখানো হয় তাহ'লে লেখা মানসম্মত হ'ল না।

প্রাথমিক লেখকরা মনে করে, লেখার মাঝে কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলেই প্রবন্ধ ভাল হয়। সাহিত্যের মান বাড়ে। এমন চিন্তা আদৌ ঠিক নয়। বরং সহজ, সাবলীল ও প্রমিত ভাষায় পাঠকের কাছে বক্তব্য পৌঁছাতে পারাই মুখ্য। 'কোন শব্দে বলা হচ্ছে' এর চেয়ে 'কি বলা হচ্ছে' সেটাই পাঠকের কাছে আগ্রহের বিষয়। লেখার মান বাড়াতে হ'লে সহজ ভাষায় এমন কিছু উপস্থাপন করতে হবে যা আর দশজন লেখকের চেয়ে আলাদা। অর্থাৎ একটি পরিচিত বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেভাবে আর দশজন করে না। এটাই তোমাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করবে। শব্দের দুর্বোধ্যতার মাঝে কখনো লেখার মান খুঁজতে যাওয়া উচিত নয়।

প্রাথমিক লেখকরা আরেকটি ভুল করে থাকে। তা হ'ল, তারা মনে করে, লেখা যত বড়, ততই মানসম্মত। এটা সঠিক নয়। বরং উত্তম কথা সেটাই যা কম হয় এবং সরাসরি মূলভাবকে স্পষ্ট করে। এখানে আমাদের একজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি পরীক্ষার পূর্বে আমাদেরকে বলে দিতেন, 'যে প্রশ্নে যতটুকু চাওয়া হয়েছে, উত্তর ঠিক ততটুকুই হবে। অপ্রয়োজনীয় কথা যত বেশী হবে ততই নম্বর কমানো হবে। সাহিত্য চর্চার জন্য ক্ষেত্র রয়েছে। পরীক্ষার খাতা সাহিত্য চর্চার স্থান নয়'। তখন মনে হ'ত, বেশী লেখব, বেশী

নম্বর দিবে। বেশী লেখায় নম্বর কমবে কেন! এখন বুঝি, তিন লাইনের একটি ভাব পাঁচ লাইনে প্রকাশ করা কোন মহান বিষয় নয়। তিন লাইনের ভাব দেড় লাইনে প্রকাশ করতে পারাই যোগ্যতা। সুতরাং প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর বাইরের কথা যেন না আসে। প্রয়োজনে প্রবন্ধ ছোট হোক। যে ভাব অল্প কথাতেই প্রকাশ করা যেত সেটা যেন দীর্ঘ কথার ফিরিস্তি হয়ে না যায়। এতে লেখার মান নষ্ট হয়।

প্রাথমিকদের আরেকটি সমস্যা হ'ল, ছোট লেখা খুব সুন্দর লেখে। তবে প্রবন্ধ লেখতে গেলেই কথার ধারাবাহিকতা হারিয়ে যায়। উপস্থাপনা এবড়ো থেবড়ো হয়ে যায়। এদিকে অগোছাল লেখা পড়তে গিয়ে পাঠক আগ-পিছ মেলাতে পারে না। ফলে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এজন্য লেখার সুশৃঙ্খল বিন্যাস খুব যরূরী। এক অনুচ্ছেদের সাথে পরের অনুচ্ছেদের যেন যৌক্তিক ধারাবাহিকতা থাকে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। খাপছাড়া বা অগোছালো উপস্থাপনা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। এজন্য লেখার পরে নিজেই কয়েকবার পাঠকের ভূমিকা পালন করতে হবে। নিজেই পড়ে দেখতে হবে, কথাগুলো ধারাবাহিক হয়েছে কি-না। বাক্য, প্যারা ইত্যাদি আগ-পিছ করে যথাযথ সম্পাদনার মাধ্যমে নিজেকেই আগে লেখা সুন্দর করতে হবে। লেখাটি যখন লেখককে পড়তে ভাল লাগবে, তখনই পাঠকেরও ভাল লাগবে।

যদি লেখাটি গবেষণাভিত্তিক হয় তবে তথ্যের যথার্থতা ও প্রামাণিকতা থাকতে হবে। রেফারেন্স বা তথ্য যেন নির্ভুল হয়, এটা খেয়াল রাখতে হবে। অনুমাননির্ভর কথা পরিহার করতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, গবেষণামূলক বা তথ্যবহুল লেখায় অতিরিক্ত আবেগ বা ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ নেই। গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধকে সর্বদা তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে দাঁড় করাতে হয়। সাধারণ প্রবন্ধেও যদি লেখার মাঝে কোন বিতর্কিত কথা চলে আসে তবে রেফারেন্স ও বাস্তবতার নিরিখে তার যথার্থতা সাব্যস্ত করতে হবে। এসব স্থানে কখনোই আবেগ বা রাগ-ক্ষোভের আশ্রয় নেওয়া সমীচীন নয়। সর্বশেষে প্রবন্ধের বানান ও বাক্যগঠন ভালভাবে দেখতে হবে। ব্যাকরণগত ভুল এবং অস্পষ্ট বাক্যগঠন প্রবন্ধের মান কমিয়ে দেয়। সেদিকে কড়া নযর রাখতে হবে। এভাবে লেখা শুরু করলে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার পরে প্রবন্ধই লেখককে শিখিয়ে দিবে যে, কিভাবে প্রবন্ধ লিখতে হয়।

শেষ কথা : প্রবন্ধ কেবল শব্দের গাঁথুনি নয়, এটি সমাজ ও মানুষের কাছে সত্য ও সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার এক বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ব। নিয়ম মেনে চর্চা করলে যে কেউই এই শিল্পে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। আমরা চাই, নবীনদের কলম থেকেও এমন সব প্রবন্ধ আসুক, যেগুলো জাতির উপকারে আসবে। যে প্রবন্ধগুলো লেখকের অর্জিত ইলমকে ইলমে নাফে'-তে রূপান্তর করবে। লেখকের কলমের কালির মাধ্যমে এমন আলো বিচ্ছুরিত হবে, যার মাধ্যমে আমরা দেখব নতুন নতুন কল্যাণের পথ। নবীনরা হবে আমাদের ছাদাক্বায়ে জারিয়ার মাধ্যম। এতটুকুই কাম্য।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

দারুস সুন্নাহ শপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন :

০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪

অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop

সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন (নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

দারুল আবরার লাইব্রেরী

এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাফসীর পাবলিকেশন'-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -সম্পাদক।

হামের প্রাদুর্ভাব : কারণ, লক্ষণ ও করণীয়

*- ডা. মেহেদী হাসান মনিম**

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে হামের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুরা এই রোগে বেশী আক্রান্ত হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ। হাম অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ হওয়ায় দ্রুত এক শরীর থেকে অন্য শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সঠিক সময়ে সচেতনতা অবলম্বন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

হাম কী এবং কেন হয় : হাম মূলত 'মিজেলস' (Measles) নামক এক প্রকার অতি-ছোঁয়াচে ভাইরাসের সংক্রমণে হয়ে থাকে। এই ভাইরাসটি প্রথমেই মানুষের শ্বাসতন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং পরবর্তীতে রক্তের মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য কোষে ছড়িয়ে পড়ে। এটি এতই সংক্রামক যে, আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা টিকা না-নেওয়া প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই এই রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। সাধারণত রোগীর হাঁচি-কাশি থেকে বের হওয়া ক্ষুদ্র তরল ফোটা বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই ভাইরাস বাতাসে ছড়ায়। পরবর্তীতে কোন সুস্থ মানুষ সেই বাতাস গ্রহণ করলে ভাইরাসটি তার শ্বাসতন্ত্রে প্রবেশ করে তাকেও সংক্রমিত করে। উল্লেখ্য, হামে সাধারণত ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরাই বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে।

হামের উপসর্গ ও লক্ষণসমূহ :

ভাইরাস শরীরে প্রবেশের সাধারণত ১০ থেকে ১৪ দিন পর রোগটির লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। হামের ক্ষেত্রে সাধারণত পর্যায়ক্রমে নিচের উপসর্গগুলো দেখা যায় :

১. প্রাথমিক লক্ষণ : শুরুতেই রোগীর অত্যধিক ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ হয় এবং খাওয়ার রুচি একেবারেই কমে যায়। এর সাথে সর্দি, কাশি, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়।

২. তীব্র জ্বর : প্রথমদিকে জ্বর কিছুটা কম থাকলেও ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে। অনেক সময় এই জ্বর ১০৩ থেকে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে যেতে পারে।

৩. লালচে গুটি বা র‍্যাশ : জ্বর শুরু হওয়ার ৩ থেকে ৫ দিন পর মুখমণ্ডল ও কানের পেছন থেকে ছোট ছোট লালচে দানা বা র‍্যাশ বের হতে শুরু করে, যা খুব দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. চুলকানিহীন দানা : উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, হামের কারণে শরীরে উঠা এই লালচে দানা বা র‍্যাশে সাধারণত কোন চুলকানি থাকে না।

হামের ক্ষতিকর দিক ও জটিলতা : সঠিক সময়ে যত্ন না নিলে হাম থেকে মারাত্মক শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে

পারে। বিশেষ করে অপুষ্টিতে ভোগা ও টিকা না নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে হামের কারণে সিভিয়ার নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, কানের ইনফেকশন, মস্তিষ্কে প্রদাহ (এনসেফালাইটিস) এবং অন্ধত্বের মতো ভয়াবহ পরিণতি ঘটতে পারে।

হামের চিকিৎসা ও করণীয় :

সাপোর্টিভ কেয়ার : জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল এবং শরীর ঠান্ডা রাখতে কুসুম গরম পানি দিয়ে গা মুছে দিতে হবে।

তরল খাবার : প্রচুর পানি, ডাবের পানি, ফলের রস ও তরল খাবার খাওয়াতে হবে, যাতে পানিশূন্যতা না হয়।

ভিটামিন এ : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হামের চিকিৎসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্রাম ও আইসোলেশন : রোগীকে আলাদা রুমে বিশ্রাম নিতে হবে এবং প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিরোধ : হাম প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় হ'ল সঠিক সময়ে শিশুকে হাম ও রুবেলার (MR/MMR) টিকা দেওয়া। শিশুর ৯ মাস পূর্ণ হ'লে হামের প্রথম ডোজ এবং ১৫ মাস বয়সে দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

উপসর্গ দেখা দিলে কী করবেন?

হামের উপসর্গ দেখা দিলে ঐ শিশুকে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা রাখুন এবং দ্রুততম সময়ে নিকটস্থ সরকারী হাসপাতাল বা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করতে হবে। আক্রান্ত রোগী বুকের দুধ পান করা শিশু হ'লে এ সময় কোনভাবেই তা বন্ধ করা যাবে না। এছাড়া ভাইরাসের বিস্তার রোধে রোগী এবং সেবাদানকারী উভয়কেই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং রোগীকে জনসমাগমপূর্ণ স্থানে নেওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

বিপজ্জনক লক্ষণ : ডায়রিয়া, বারবার বমি হওয়া, কান পাকা (কান থেকে পুঁজ বা পানি পড়া), শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি বা শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে হাসপাতালে নিতে এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয়।

পরিশেষে বলব হাম একটি ঝুঁকিপূর্ণ রোগ। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া সম্ভব ইনশাআল্লাহ।

**মেডিসিন চিকিৎসক ও সদস্য, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম।*

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
☎0721-773721, 01712-439021
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা
ইয়াসীন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড,
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মেসার্স হাসান হার্ডওয়ার এণ্ড ইলেকট্রিক
এখানে হার্ডওয়ার সামগ্রী, রং, পলিথিন এবং ইলেকট্রনিক্স এর মালামাল খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
প্রোঃ মোঃ হাসান আলী
উত্তর নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড) সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৯২০-৭২১৯৩৫।

যুগে যুগে কুরবানী : আত্মত্যাগের চিরন্তন ইতিহাস

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ*

ভূমিকা : মানব ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই কুরবানী আত্মত্যাগের এক মহান প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত। কুরবানী কেবল পশু যবেহ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়। বরং এটি গভীর আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা মানুষকে তাক্বওয়া, ত্যাগ এবং আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয়। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের কুরবানীর ঘটনা থেকে শুরু করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের সামনে কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরে। মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সত্য ও ন্যায়ের পথে নিজের প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করার এই অব্যাহত ধারা পরবর্তীকালে অন্যান্য নবীদের যুগ অতিক্রম করে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যুগে এসে পূর্ণতা লাভ করে। যা আজও মুসলিম উম্মাহ্র জীবন বিধান এবং মানুষের পশু প্রবৃত্তিকে দমন করে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার নিরন্তর সংগ্রাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ- 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা যবহ করার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ গবাদিপশু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন' *(হজ্জ ২২/৩৪)*।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ত্যাগের এই মহান ধারাটি সৃষ্টির শুরু থেকে প্রতিটি নবীর যুগেই ইবাদত হিসাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার স্বরূপ বা পদ্ধতি কি ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নবী-রাসূলগণের যুগে কুরবানীর ঘটনা পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরবানীর সেই ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরা হল।

আদম (আঃ)-এর যুগ : কুরবানীর সূচনা

আমরা জানি ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কুরবানীর সূত্রপাত ঘটে পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র ক্বাবীল ও হাবীলের মাধ্যমে। ক্বাবীল ছিল আদম (আঃ)-এর বড় সন্তান এবং হাবীল ছিল তার ছোট। ক্বাবীল কৃষিকাজ করত এবং হাবীল পশুপালন করত। তারা দু'জনেই আল্লাহ্র নামে কুরবানী করেছিল। কিন্তু কেন তারা কুরবানী করেছিল, সে স্থানটি কোথায় ছিল এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছে ছহীহ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ক্বাবীল কুরবানীর জন্য তার ফসলের মধ্যে নিম্নমানের কিছু শস্য পেশ করেছিল। কিন্তু হাবীল আল্লাহ্র ভালবাসায় তার পশুদের মধ্যে সর্বোত্তম দুম্বাটি কুরবানী দিল। সে যুগে নিয়ম ছিল যে, যার কুরবানী গ্রহণযোগ্য হবে আসমান থেকে আগুন এসে তার কুরবানী নিয়ে যাবে। নিয়মানুযায়ী সেদিন আগুন হাবীলের কুরবানী নিয়ে গেল কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী সেখানেই থেকে গেল। এই রাগে, ক্ষোভে ও হিংসায় ক্বাবীল নিজের আপন ছোট ভাই হাবীলকে হত্যা করল। এতে পৃথিবীর ইতিহাসে একদিকে হিংসাত্মক হত্যাকাণ্ডের প্রথম মহাপাপ সংঘটিত হল, অপরদিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মদানের মহান আদর্শের পরম্পরা সূচিত হ'ল।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগ : পিতা-পুত্রের ঐতিহাসিক পরীক্ষা

একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষের মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়? তিনি বললেন, নবীগণ'।[১] মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা নবী ইব্রাহীম (আঃ)-কে একের পর এক কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর জীবনের পড়ন্ত বয়সে আল্লাহ তাঁকে একটি পুত্রসন্তান দান করেছিলেন। যে সন্তান ছিল তাঁর হৃদয়ের প্রশান্তি, চোখের শীতলতা। কিন্তু বেশীদিন সেই সন্তানকে বুকে জড়িয়ে স্নেহ-সুখ উপভোগ করার সৌভাগ্য তাঁর হ'ল না। সন্তানের মুখে 'বাবা' ডাক শোনার আগেই দুগ্ধপোষ্য শিশু এবং তার মা হাজেরাকে জনমানবহীন নির্জন মরূপ্রান্তর মক্কার বিরানভূমিতে রেখে আসার নির্দেশ এল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। চারপাশে নেই কোন জনপদ, নেই পানির উৎস, নেই জীবনের কোন চিহ্ন, আছে শুধুই নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতা। ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। বুকভরা কষ্ট, চোখভরা অশ্রু নিয়ে তিনি আল্লাহ্র আদেশ পালন করলেন। মা হাজেরা ও আদরের শিশুপুত্র ইসমাঈলকে ফিলিস্তীনের কেনান থেকে মক্কায় রেখে আসলেন।

এরই মধ্যে কেটে গেল অনেক বছর। ইব্রাহীম (আঃ) মাঝে-মধ্যে মা ও ছেলেকে দেখে আসতেন। যখন ইসমাঈল (আঃ)-এর ১৩ বা ১৪ বছরের কিশোর তখন আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে আরেকটি কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন। ইব্রাহীম (আঃ) পরপর তিনরাত স্বপ্নে দেখলেন তিনি স্বীয় পুত্রকে যবেহ করছেন। নবীদের স্বপ্ন যে অহী তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই বিন্দুমাত্র দেরী না করে সন্তানকে মক্কা থেকে মিনা প্রান্তরে নিয়ে চললেন। এই পথে ইবলীস শয়তান তিনবার এসে তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই ইব্রাহীম (আঃ) দৃঢ়চিত্তে শয়তানকে সাতটি করে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে প্রতিহত করলেন। ঈমানের দৃঢ়তা শয়তানের সব কুমন্ত্রণাকে পরাজিত করল। অবশেষে সেই হৃদয়বিদারক মুহূর্ত উপস্থিত হ'ল। মিনায় পৌঁছে পিতা তাঁর প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে বললেন, يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. তিরমিযী হা/২৩৯৮; মিশকাত হা/১৫৬২; ইবনে মাজাহ হা/৪০২৩।

أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ‘হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন ভেবে দেখ তোমার অভিমত কি?’ ইসমাঈল (আঃ) বললেন, يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ‘হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন’ (*ছাফফাত ৩৭/১০২*)।

কী অসীম আত্মসমর্পণ! কী অবিচল ঈমান! স্বপ্নে পাওয়া এক পরোক্ষ আদেশ পালনে পিতার যেমন ছিল নিখুঁত আনুগত্য, ঠিক তেমনি নিজের জীবনকে আল্লাহ্র পথে দ্বিধাহীন চিত্তে উৎসর্গ করতে পুত্রেরও ছিল অনন্য আত্মনিবেদন। বছরের পর বছর যে সন্তানের জন্য ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে অশ্রুসিক্ত নয়নে দো‘আ করেছিলেন, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সেই কলিজার টুকরোকে পেয়েও পিতৃত্বের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাননি। অথচ তাকেই নিজ হাতে যবেহ করার কঠিনতম পরীক্ষায় তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হলেন না। সেদিন ছিল ১০ই জিলহজ্জ।[২] ইব্রাহীম (আঃ) ছুরি হাতে প্রস্তুত হ’লেন এবং ইসমাঈল (আঃ)-কে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশ থেকে ভেসে এলো মহান আল্লাহ্র সেই চিরন্তন ঘোষণা, ‘হে ইব্রাহীম! অবশ্যই তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা’ (*ছাফফাত ৩৭/১০৫-৬*)। ইব্রাহীম (আঃ) পিছনে তাকিয়ে দেখেন একটি সাদা শিংওয়ালা দুম্বা দাঁড়িয়ে আছে।[৩] পিতা-পুত্র সেই দুম্বা কুরবানী করে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। এই দুম্বাটি ছিল আদম (আঃ)-এর সন্তান হাবীলের দেওয়া কুরবানী।[৪] আল্লাহ তা‘আলা দুম্বাটি ইসমাঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে পাঠিয়ে প্রথম কুরবানীর ঐতিহ্যের সাথে এক গভীর শরী‘আতগত মেলবন্ধন স্থাপন করলেন এবং এটিকে পরবর্তী উম্মতের জন্য বিধান হিসাবে নির্ধারণ করে দিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর ১০ই যিলহজ্জে কুরবানী করে থাকে; যা আল্লাহ্র প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, ত্যাগ এবং তাক্বওয়ার এক অনন্য শিক্ষা বহন করে।

মূসা (আঃ)-এর যুগ : বনু ইস্রাঈলের হঠকারিতা

মানুষের লোভ আর হঠকারিতা কতটা ভয়াবহ হ’তে পারে তার এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারায় বর্ণিত বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনায় ফুটে উঠেছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর নাতি নবী ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধর বনী ইসরাঈলের এই ঘটনার সাথে কুরবানীর বিধান জড়িয়ে আছে। যেখানে আল্লাহ্র নির্দেশে একটি গাভী যবেহ করার মাধ্যমে এক গুপ্ত হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয় এবং একই সঙ্গে আনুগত্য ও অবাধ্যতার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বনী ইসরাঈলের এক যুবক লোভে পড়ে তার একমাত্র চাচাতো বোনকে বিয়ে করে চাচার বিপুল সম্পত্তির একক মালিক হ’তে চেয়েছিল। কিন্তু চাচা বিয়েতে রাযী হ’ল না। ফলে যুবক সম্পত্তির লালসায় অন্ধ হয়ে আপন চাচাকেই গোপনে হত্যা করে বসল। পরদিন সে নিজেই কান্নাকাটি করে কওমের নেতাদের কাছে বিচার দাবি করল, যেন কেউ তাকে সন্দেহ করতে না পারে। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে আসামী চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় নেতারা বিচারের জন্য মূসা (আঃ)-এর কাছে আসলেন। মূসা (আঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহি-র মাধ্যমে জেনে গেলেন যে, স্বয়ং বাদীই তার চাচাকে হত্যা করেছে। কিন্তু সরাসরি অপরাধীর নাম ঘোষণা না করে আল্লাহ এক বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সত্য উৎঘাটনের নির্দেশ দিলেন। মূসা (আঃ) নেতাদেরকে বললেন, এই গুপ্তহত্যার রহস্য উন্মোচনের জন্য আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঠিক তখনই বনী ইসরাঈলের স্বভাবজাত কুযুক্তি আর টালবাহানা শুরু হ’ল। তারা সরল আদেশকে জটিল করতে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দিল যে, গাভীটির বয়স কত? রং কেমন? সেটি কাজে অভ্যস্ত কি না? প্রতিবারই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শর্তগুলো আরো নির্দিষ্ট ও কঠিন হ’তে লাগল। ফলে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সেই গাভীটি খুঁজে পাওয়া তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। তারা দীর্ঘ সময় ধরে হন্যে হয়ে গাভীর সন্ধান করতে থাকল।

অবশেষে তারা এমন এক গাভী খুঁজে পেল যেটা না খুব বৃদ্ধ, না একেবারে অল্পবয়সী; বরং মাঝামাঝি বয়সের। তার রং ছিল উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ, যা দর্শকদের চোখ জুড়িয়ে দেয়। সে গাভী কখনো জমিতে হাল চাষ বা পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি। এক কথায় সুঠাম ও খুঁতহীন। সেই দুর্লভ গাভীটি খুঁজে পাওয়ার পর তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যবেহ করল। তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিস্ময়কর নির্দেশ এলো। আল্লাহ বললেন, ‘যবেহকৃত গাভীর একটি অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত করো’ (*সূরা বাক্বারাহ ২/৭৩*)। আঘাত করার সাথে সাথে নিথর দেহটি মুহূর্তের জন্য জীবিত হয়ে উঠল এবং সবার সামনে তার হত্যাকারী ভাতিজার নাম বলে দিয়ে পুনরায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আল্লাহ্র কুদরতে সত্য প্রকাশিত হ’ল। এই অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা কেবল একটি গুপ্তহত্যার রহস্যই উন্মোচন করেননি, বরং ক্বিয়ামতের দিন মৃতকে পুনর্জীবিত করার বাস্তব প্রমাণও পেশ করেছেন। মূলত আল্লাহ্র আদেশের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। বনী ইসরাঈলরা যদি শুরুতেই আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে যেকোন একটি সাধারণ গাভী যবেহ করত, তবে তাদের এত কষ্ট করতে হ’ত না। এতকিছুর পরেও আল্লাহ্র নিদর্শনের চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হ’তে দেয়নি।

---

২. *তাফসীরে কুরতুবী, ১৫/১০২ পৃ.।*
৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৭০৭।*
৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী-১ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, অক্টোবর ২০১০), পৃ. ৪৪।*

ইলিয়াস (আঃ)-এর যুগ : হক-বাতিলের পরীক্ষা

তৎকালীন ফিলিস্তীনের বাদশাহ আখিয়াব এবং রাণী ইযবেল ছিলেন বাআল দেবতার অনুসারী। তারা বিরাট মন্দির তৈরী করে সকলকে বাআল দেবতার পূজা করতে নির্দেশ জারি করেছিলেন। রাজার আদেশে সকলেই শিরকের অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল। এই জাতিকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা ইলিয়াস (আঃ)-কে নবী হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দু'একজন ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। একটা পর্যায়ে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে তিনি দূর পাহাড়ে আত্মগোপন করেন এবং এই অবাধ্য জাতির জন্য দুর্ভিক্ষের বদ দো'আ করলেন। এমতাবস্থায় দেশে প্রকট আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন ইলিয়াস (আঃ) আত্মগোপন থেকে বের হয়ে সরাসরি রাজ দরবারে গিয়ে বললেন, আল্লাহ্র অবাধ্যতার জন্যই তোমাদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে। তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্যতা ছেড়ে দিয়ে তাঁর ইবাদত করো, তবেই তিনি দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দিবেন। তিনি আরো বললেন, তোমরা দাবি করো যে তোমাদের বাআল দেবতার নাকি সাড়ে চারশ' নবী রয়েছে। তাহ'লে চলো একটা সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা হয়ে যাক। তোমরা সবাই মিলে বাআল দেবতার নামে কুরবানী পেশ কর, আর আমি একাকী আমার আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করি। যার কুরবানী আসমান থেকে নেমে আসা আগুন গ্রহণ করবে তার ধর্মই সত্য বলে গৃহীত হবে।

এই যৌক্তিক চ্যালেঞ্জ রাজা ও মূর্তিপূজারীরা সানন্দে গ্রহণ করল। অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে 'কোহে কারমাল' নামক এক পাহাড়ি উপত্যকায় সবাই সমবেত হ'ল। প্রথমে বাআল পূজারীরা তাদের কুরবানী পেশ করল। নিমগ্ন সাধনা আর অনবরত কান্নাকাটি করতে করতে সকাল গড়িয়ে দুপুর হ'ল কিন্তু আকাশ থেকে আগুন তো দূরের কথা আগুনের একটা ফুলকিও আসল না। এরপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরই আসমান থেকে আগুন নেমে এসে সেই কুরবানী ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে বহু মানুষ আল্লাহ্র সিজদায় লুটিয়ে পড়ল কিন্তু বাআল পূজারী অন্ধ ধর্মনেতারা মুশরিকই থেকে গেল। যুগে যুগে এভাবেই আল্লাহ তা'আলা বাতিলকে পরাজিত করে হকের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন।

জাহেলী যুগ : ইব্রাহীমী সুন্নাতের বিকৃতি

আরব জাতির পিতা ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)। সেজন্য জাহিলী যুগে মক্কার লোকেরা দাবী করত তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম অনুসরণ করে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রকৃত দ্বীনকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই কা'বাকে কেন্দ্র করে ইবাদত, তাওয়াফ এবং হজ্জের বিধান চালু করেছিলেন *(হজ্জ ২২/২৬-২৭)*। আর পিতা-পুত্রের কুরবানীর ইতিহাস তো যুগ যুগ ধরে জীবন্ত ছিল। যেই কা'বাকে ইব্রাহীম (আঃ) তাওহীদের কেন্দ্রভূমিতে রূপান্তর করলেন, সেই কা'বার চতুর্পাশে মূর্তি স্থাপন করে মক্কার লোকেরা শিরকের আখড়ায় পরিণত করেছিল। তারা মূর্তির পূজা করত। কা'বায় ইবাদতের সময় শিস দিত ও তালি বাজাতো *(আনফাল ৮/৩৫)*। তাদের এই বিকৃতি কুরবানীর বিধানকেও কলুষিত করেছিল। ইব্রাহীমী সুন্নাতের পরিবর্তে তারা মূর্তির সম্মানে কুরবানী চালু করেছিল *(মায়েদাহ ৫/৩)*। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় মূর্তির নামে কুরবানী দিয়ে গোশতের কিছু অংশ মূর্তিগুলির মাথায় রাখত ও তার উপরে কিছু রক্ত ছিটিয়ে দিত। কেউবা উক্ত রক্ত কা'বাগৃহের দেওয়ালে লেপন করত।[৫] এভাবে তারা ইব্রাহীমী সুন্নাতের মূল চেতনা পরিত্যাগ করে কুসংস্কার ও শিরকের গভীর অন্ধকারে পতিত হয়েছিল।

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ : উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে মানবজাতি লাভ করে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগ থেকে প্রচলিত কুরবানীর বিধান রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এসে শিরকমুক্ত, বিশুদ্ধ তাওহীদভিত্তিক ইবাদতে পরিণত হয়। জাহেলি যুগের কদর্য প্রথা বিলুপ্ত করে মহান আল্লাহ ঘোষণা দেন, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى 'ওগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের আল্লাহভীরুতা' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। আল্লাহভীরুতা তথা ইখলাছই ছিল ইব্রাহীমী কুরবানীর প্রকৃত চেতনা। এই চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে রাসূল (ছাঃ) নিজে নিয়মিত কুরবানী দিয়েছেন এবং এই বিধান ক্বিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে বিদ্যমান রাখার জন্য বিদায় হজ্জের ভাষণে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী'।[৬] চৌদ্দশত বছর ধরে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে প্রতিটি মুসলিম পরিবারের কুরবানী স্রেফ পশু যবেহ নয়, বরং নিজের কুপ্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে মহান আল্লাহ্র সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণের এক জীবন্ত অঙ্গীকার।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, কুরবানীর ইতিহাস আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত প্রবহমান এক অবিচ্ছিন্ন ও শাশ্বত ইবাদত। এই ইবাদত কিয়ামত পর্যন্ত মুমিন হৃদয়ে ত্যাগের প্রেরণা জাগ্রত করবে। পশুর গলায় ছুরি চালানোর মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি তার ভেতরের আমিত্ব, অহংকার এবং পশুত্বকেই কুরবানী দিতে শিখবে। মহান আল্লাহ আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫. তাফসীর ইবনে কাছীর ৫/৪৩১; তাফসীরে মাযহারী ৬/৩২৫।
৬. তিরমিযী হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১৪৭৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮।

কবিতা

হজ্জের আহবান

-মিছবাহুল হক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

হজ্জের ডাক শুনিয়া ছুটেছে কা'বার পানে,
'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা'র সুর বাজিছে আসমানে।
একই মিলনের মহিমায় একাকার আজ জাতি,
তুরস্ক, চীন, আরব-বেদুঈন, সবাই সবার সাথী।
নেই কোন ভেদ আমীর-ফকীরে, চূর্ণ অহংকার,
সাদা ইহরামে সেজেছে সবাই, খুলেছে প্রেমের দ্বার।
সুলতান আর ভিখারি দাঁড়িয়ে একই কাতারে আজ,
মাথায় মুকুট নেই কারো, ধূলায় লুটেছে তাজ।
আরাফার মাঠে কান্নার রোল, রহম সেথায় ঝরে,
পাপের পাহাড় ধুয়ে মুছে বান্দা সিজদা করে।
একই ক্বিবলায় নত লাখো শির, এক আল্লাহ্র ধ্যানে,
বিশ্ব-মুসলিম গেঁথেছে হৃদয় মিলনের আহ্বানে।
বাদশাহ আর কেনা-গোলামের নেই কোন ব্যবধান,
সকলের মুখে এক কালেমা, এক কুরআনের গান।
নিবিড় প্রেমের আলিঙ্গনে ভুলেছে আপন-পর,
কা'বার ছায়ায় নিখিল বিশ্ব এক মিলনের ঘর।
ছাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে বুকে ঈমানের জোশ,
শয়তানে আজ মারিয়া পাথর ঘুচায় মনের রোষ।
কুরবানী দিয়ে পশুর সাথেতে কাটে নিজ পশু-মন,
মুসলিম আজ নিখিল ধরায় এক আত্মা, একজন!
ফিরে যাবে যবে নিজ নিজ দেশে বুকে নিয়ে এই স্মৃতি,
দিকে দিকে তারা গাইবে আবার সাম্য-প্রেমের গীতি।
ইসলাম মানে সাম্যের বাণী, নেই ছোট-বড় কেউ,
মুসলিম উম্মাহ এক সাগরের লাখো মিলনের ঢেউ!

আয়াতের স্পর্শে ভোর

-মুবাশশির, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জেগেছে যখন মুক্তমাখা ক'টি প্রাণ,
কণ্ঠ যখন ছুঁয়েছে আল-কুরআন,
প্রত্যুষে তখন ফুটেনি ভোরের আলো,
প্রভুর আসমানে লাগে ভিষণ ভালো!
পবিত্র নির্মল কলুষতাহীন বক্ষে
আল্লাহ্র পূত বাণী ধারণের লক্ষ্যে,
অবসর কাটিয়েছে যে জন শৈশবে
পথ তার প্রস্তুত নিত্য নব বৈভবে।
যে বান্দা-বান্দী মধুর বিভ্রমে
খাটে রাত্রি দিন এক করা পরিশ্রমে...
সাড়ে তিন হাযার আয়াতের এ স্পর্শে
সত্বর হাসবে সে ফেরদৌসের হর্ষে!
একটি জান্নাতী মুকুটের পূণ্য লোভে,
মোদের হিফয আজ শুরু হোক তবে।

কুরবানীর চেতনা

-আবূ রায়হান
-বাগাতিপাড়া, নাটোর।

কুরবানী নয়, গোশতের ভোজ
শোন রে মুমিন ভাই!
অন্তরে তোর ইব্রাহীমের
ঈমান কি আজ নেই?
মনের পশু যবেহ করে,
ছাড়রে অহংকার!
লোভ-লালসার গর্দানে আজ
হানরে তলোয়ার!
রক্ত-হাড্ডি, গোশতের ভাগে
পুণ্য মেলে কি আর?
তাক্বওয়া ছাড়া মিছেই কেবল
রক্তের হাহাকার!
ত্যাগের কথা ভুলে গিয়ে
মাপিস গোশতের ভাগ?
নফসের গায় চালাও ছুরি,
ঈমানের তেজে জাগ!

মুফতীর বাজার

-মুহাম্মাদ রিযওয়ানুল হক
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

এ কেমন দেশ! হাটে-মাঠে মুফতিরই সমারোহ,
কুরআন-হাদীছ না জেনে দেয় ফৎওয়া অহরহ।
না আছে ইলম, নেই হিকমত তাদের হৃদয় মাঝে,
তবুও গলাবাজি করে তারা বড় আলেম সাজে!
ছাহাবী-তাবেঈ ছিলেন যারা ইলমের দীপধারী,
ফৎওয়া দিতে কাঁপত হৃদয় ভয় হ'ত বেশ ভারী।
একটি বাক্য বলার আগে কাঁদতেন রাতভর,
আজ সে ফৎওয়া অঙ্গনে সব মূর্খেরা যাদুকর।
রামাযান এলে শুরু হয় ভাই ফৎওয়াবাজির খেলা,
ছালাত-যাকাত-হজ্জ-ফেৎরা সবকিছু হয় ঘোলা।
মুছল্লী ভাবে, একি বিপদ! হারালাম নাকি দিক!
একেকজনে একেকটা কয়, সবাই নাকি ঠিক!
এমবিবিএস চিকিৎসক থেকে হাতুড়ে ডাক্তার,
ব-কলম থেকে শুরু করে উকীল ও মোক্তার,
সবাই বোঝে কুরআন-হাদীছ, করে ফৎওয়াবাজি,
মসজিদগুলো কাঁপিয়ে তোলে এদের গলাবাজি।
দাওয়াত দিলে হিকমতে দাও, দাও সত্যের আলো,
তুমিই বল, ফৎওয়ার নামে বিভ্রান্তি কি ভাল?
নিজের আমল যাচাই করো, কতটুকু শুদ্ধ হয়,
অন্যের দোষ খুঁজতে গিয়ে আমল করো না লয়।

স্বদেশ

দেশে গত এক বছরে কোটিপতি বেড়েছে ১২ হাযার

দেশের অর্থনীতির ধীরগতি, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধির মতো উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মাঝেই মাত্র এক বছরে ব্যাংক খাতে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা প্রায় ১২ হাযার বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যমতে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে থাকা ১ লাখ ২২ হাযার ৮১জন থেকে বেড়ে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে কোটি টাকার ব্যাংক হিসাবধারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৪ হাযার ৪৪জনে। উল্লেখ্য ২০২০ সাল থেকেই এই হিসাবের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বমুখী।

[স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে দেশে মাত্র ৫ জন কোটিপতি ছিলেন। সেখান থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ১ লাখ ৩৪ হাযার ৪৪ জন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিষময় ফল এটি। আমরা সরকারের নিকটে দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালু করার দাবী জানাচ্ছি (স.স.)]

চাঁদাবাজদের ৯০ ভাগই রাজনৈতিক নেতাকর্মী

চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য রোধে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ৬৪ যেলায় মোট ৩ হাযার ৮৪৯ জন চাঁদাবাজের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করেছে পুলিশ। যার মধ্যে শুধু ঢাকা মেট্রোপলিটন (ডিএমপি) এলাকায় ১ হাযার ২৫৪ জন এবং বাকি ২ হাযার ৫৯৫ জন অন্যান্য যেলায় সক্রিয়। পুলিশের তথ্যমতে তালিকাভুক্তদের প্রায় ৯০ শতাংশই কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা ব্যক্তি। যারা সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রূপ বদলে হাট-বাজার, বাস স্ট্যাণ্ড, নৌঘাট ও নির্মাণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন খাত থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে। চাঁদা না পেলে ব্যবসা বা নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ রয়েছে এই চাঁদাবাজির টাকার একটি বড় অংশ কিছু অসাধু রাজনীতিক ও পুলিশের পকেটে যায়।

৭৬ হাফেযের 'রত্নগর্ভা' গ্রাম ঝাউগড়া

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপযেলার ধুরাইল ইউনিয়নের ঝাউগড়া গ্রাম আজ 'রত্নগর্ভা' হিসাবে এক অনন্য রেকর্ডের মালিক। কারণ এই ছোট্ট গ্রামেই গড়ে উঠেছেন ৭৬ জন কুরআনের হাফেয। গ্রামের বিভিন্ন মাদ্রাসা- বিশেষ করে ডুবারপাড় মাদ্রাসা ও বনপাড়া মাদ্রাসা এই অর্জনের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ দুই প্রতিষ্ঠানে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীরা কুরআন শিক্ষায় নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করে এবং ধীরে ধীরে হিফয সম্পন্ন করে কুরআনের হাফেয হওয়ার গৌরব অর্জন করছে। গ্রামের অভিভাবকরা জানান দারিদ্র্য ও নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় উৎসাহিত করে চলেছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কুরআনের শিক্ষাই সন্তানদের নৈতিক ও আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে। তাই আর্থিক কষ্ট থাকলেও তারা সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠাতে পিছপা হন না।

[আল্লাহ এইসব হাফেয, অভিভাবক এবং মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষকে হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ক্বিয়ামতের দিন নূরের মুকুট পরিধান করিয়ে সম্মানিত করুন! (স.স.)]

হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিল অসুস্থ কাক!

গত ১৫ই এপ্রিল বুধবার সকালে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপযেলা প্রাণিসম্পদ ও ভেটেরিনারী হাসপাতালে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। পক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার আশায় একটি কাক নিজেই হাসপাতালের বারান্দায় এসে হাযির হয়। কাকটির শরীরে অসংখ্য বিষফোঁড়া দেখে চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যথানাশক ও অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করেন। অবাক করার বিষয় হ'ল, চিকিৎসার পুরো সময় কাকটি একদম শান্ত ছিল এবং চিকিৎসকদের কোন বাধা দেয়নি। চিকিৎসা শেষে সে উড়ে যায়। কিন্তু অল্প দূর গিয়েই আবার ফিরে আসে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সে পুনরায় উড়ে যায়। চিকিৎসকদের মতে সময়মতো চিকিৎসা না পেলে কাকটির মৃত্যু হ'তে পারত। কাকটি এখন হাসপাতালের আশপাশেই অবস্থান করছে।

দশ হাযার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার

জ্বালানী সংকট মোকাবিলায় ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাযার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। গত ১৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসীমুল গণী এক ব্রিফিংয়ে জানান, সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কমিয়ে প্রতি ইউনিট ৪ থেকে ৮ টাকার মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেইসাথে সোলার সিস্টেমকে আরও আধুনিক ও টেকসই করতে দেশীয় উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

নিম্ন আদালতে ৪০ লাখের বেশী মামলা *-আইনমন্ত্রী*

দেশের অধস্তন আদালতগুলিতে বর্তমানে ৪০ লাখ ৪১ হাযার ৯২৪টি মামলার বিশাল জট রয়েছে বলে সংসদকে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মোঃ আসাদুযযামান। বিচার প্রক্রিয়ার এই দীর্ঘসূত্রিতা দূর করে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে সরকার ইতিমধ্যে ৮৭১টি নতুন আদালত স্থাপন ও ২৩২টি বিচার বিভাগীয় পদ সৃষ্টিসহ বিপুল সংখ্যক বিচারক নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উচ্চ ও নিম্ন আদালতের সব 'কজ লিস্ট' অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডিজিটাল সমন জারি ও অনলাইনে সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংশোধনী আনা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আইনী অধিকার নিশ্চিতে '১৬৬৯৯' হটলাইনের মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান ও যেলা পর্যায়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত লবণ-চিনি ও চর্বিযুক্ত খাবারে বাড়ছে অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি

অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও চর্বিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারের কারণে দেশে স্থূলতা, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মতো অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বাড়ছে। যার ফলে বছরে প্রায় ৫ লাখ ৭০ হাযার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, যা দেশের মোট মৃত্যুর প্রায় ৭১ শতাংশ। দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষ নিয়মিত প্যাকেটজাত খাবার গ্রহণ করলেও এর পিছনের জটিল পুষ্টি তথ্য বুঝতে পারেন না বলে স্বাস্থ্যকর খাবার নির্বাচনে প্যাকেটের সম্মুখভাগে স্পষ্ট সতর্কবার্তা বা 'ফ্রন্ট-অব-প্যাকেজ লেবেলিং' (FOPL) চালু করা এখন সময়ের দাবী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বের ৪৪টি দেশের মতো বাংলাদেশেও এই লেবেলিং ব্যবস্থা কার্যকর হ'লে অসংক্রামক রোগের প্রকোপ হ্রাসের পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যয় অনেকাংশে কমে আসবে।

বিদেশ

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইস্রাঈল সংঘাতে ৪০ দিনের ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রাঈলের হামলার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া ভয়াবহ যুদ্ধটি গত ৮ই এপ্রিল দুই সপ্তাহের যুদ্ধ

বিরতির মাধ্যমে সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। ৪০ দিনব্যাপী চলা এই যুদ্ধে কোন পক্ষের জয়-পরাজয় নিশ্চিত না হ'লেও বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ সংকট ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি ইতিমধ্যে স্পষ্ট। এই যুদ্ধে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ীসহ শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তা এবং তিন হাযারের বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

ইরান সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি জানান যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রাঈলী হামলায় ইরানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ২৭০ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৩৩ লাখ কোটি টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে। একইসাথে হামলায় প্রায় ১ লাখ আবাসিক ভবনসহ ১ লাখ ২৫ হাযার ৬৩০টি বেসামরিক অবকাঠামো, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে হামলা চালাতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রাঈলকেও চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হয়েছে ২৮ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকা। তবে এ খরচ শেষ পর্যন্ত ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ আশংকা প্রকাশ করছেন। এছাড়া জাতিসংঘের তথ্য মতে এই সংঘাতে আরব দেশগুলোর প্রায় ১৯৪ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৪ লাখ কোটি টাকা) এবং ইস্রাঈলের ১৭.৫ বিলিয়ন ডলারের (সোয়া দুই লাখ কোটি টাকার বেশী) আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিপুল এই ক্ষয়ক্ষতি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্যই এক চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

জাতিসংঘ আরো জানিয়েছে ইরান যুদ্ধের অর্থনৈতিক অভিঘাতে বিশ্বজুড়ে অন্তত ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষ চরম দারিদ্রের শিকার হ'তে পারে। এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে উন্নয়নশীল দেশগুলো। তেহরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রাঈলের প্রথম বিমান হামলার পর জ্বালানির দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় বিশ্ব অর্থনীতিতে তেল ও গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে গোটা বিশ্ব বর্তমানে জ্বালানি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মন্থর প্রবৃদ্ধির এক ভয়াবহ ত্রিমুখী সংকটের মুখোমুখি হয়েছে।

[এই যুদ্ধে আমেরিকা ও ইস্রাঈল হ'ল হামলাকারী। অতএব এর সব দায়-দায়িত্ব তাদের। আর সে কারণে তাদের নৃশংসতার জন্য তীব্র সমালোচনা করে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুকে মানবতার শিকারী বলে আখ্যায়িত করেছে। আমরা স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাই (স.স.)]

বাংলাদেশ সীমান্তে এবার বিএসএফের পাহারাদার সাপ ও কুমির!

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৪ হাযার ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গুলি চালানো এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সমালোচিত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবার অবৈধ যাতায়াত ও চোরাচালান ঠেকাতে এক অদ্ভূত ও বিতর্কিত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম সীমান্তের কিছু অংশে অনুপ্রবেশ রোধে ইতিমধ্যেই বেড়া বিদ্যুতায়িত করা হলেও যেসব দুর্গম নদীপথ ও জলাভূমিতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ বা আধুনিক নযরদারী সম্ভব নয়, সেখানে এবার বিষাক্ত সাপ ও কুমির ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে কাংক্ষিত ফলাফলের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে তারা। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় বিএসএফের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে ওঠা এই প্রস্তাবের মূল যুক্তি হ'ল হিংস্র সরীসৃপ ছেড়ে দিলে মনস্তাত্ত্বিক ভয়ের কারণে এসব এলাকায় অবৈধ পারাপার কমে আসবে। তবে ভারতের এই অমানবিক পরিকল্পনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই সীমান্তবর্তী সাধারণ মানুষ, পরিবেশবিদ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মাঝে চরম উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এসব প্রাণী তো আর নির্দিষ্ট সীমানা মেনে চলবে না। ফলে জীবিকার সন্ধানে নদী বা জলাশয়ে যাওয়া নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রাণহানির মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হবে। এছাড়া কৃত্রিমভাবে এসব প্রাণী ছাড়লে স্থানীয় জলজ বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। মানবাধিকার কর্মীদের মতে, এটি বাস্তবায়িত হ'লে তা হবে চরম অমানবিক ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

[আমরা অবিলম্বে ভারত সরকারের প্রতি এই অমানবিক পরিকল্পনা বাতিল করার আহ্বান জানাই (স.স.)]

মুসলিম জাহান

গণতন্ত্র মানুষ মারে, এটি আমাদের জন্য নয়

-ইব্রাহীম ত্রাওরে

আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম ত্রাওয়ে দেশটির সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্রের কথা ভুলে যেতে বলেছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, গণতন্ত্র তাদের জন্য কোন সমাধান নয়। এটি একটি 'মিথ্যা' ব্যবস্থা। গণতন্ত্র মানুষ হত্যা করে, ধ্বংস ডেকে আনে। ২০২২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা ৩৮ বছর বয়সী এই নেতা লিবিয়ার উদাহরণ টেনে বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো যেখানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে সেখানেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। তিনি মুয়াম্মার গাদ্দাফির পরবর্তী লিবিয়ার অস্থিতিশীলতাকে গণতন্ত্রের ব্যর্থতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেন। ত্রাওরে দাবী করেন আফ্রিকার মানুষ এ ব্যবস্থা চায় না।

উল্লেখ্য, গত জানুয়ারীতে দেশটিতে সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে ত্রাওরে বলেন, একজন সফল রাজনীতিবিদ মানেই হ'ল মিথ্যাবাদী ও ভাঁওতাবাজ। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় ঐক্য নষ্ট করে। এছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ফ্রান্সসহ পশ্চিমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ত্রাওরের এই স্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও প্যান-আফ্রিকান অবস্থান মহাদেশটির অসংখ্য তরুণের কাছে তাকে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছে। তিনি উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ হতে হ'লে বুরকিনা ফাসোর জনগণকে প্রচলিত কর্মঘণ্টার চেয়েও অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হবে বলে জোর তাগিদ দিয়েছেন।

[বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যের সাথে আমরা শতভাগ একমত। আল্লাহ আমাদের দেশকে গণতন্ত্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন এবং ইসলামী খেলাফতের পথ সুগম করুন (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

তিন মিনিটেই জোড়া লাগবে ভাঙা হাড়!

ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে 'বোন-০২' (Bone-02) নামক এক বিশেষ ধরনের আঠা উদ্ভাবন করেছেন চীনা বিজ্ঞানীরা। যার সাহায্যে মাত্র ২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যেই ভাঙা হাড় নিখুঁত ও দৃঢ়ভাবে জোড়া লাগানো সম্ভব। সাগরের তলদেশে পাথরের গায়ে ঝিনুকের শক্তভাবে আটকে থাকার প্রাকৃতিক ক্ষমতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজ্ঞানীরা এই আঠা তৈরির অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এই আঠার সবচেয়ে বড় চমক হ'ল এটি মানবদেহে প্রাকৃতিকভাবেই শোষিত হয়ে যায়। ফলে প্রচলিত চিকিৎসার মতো বড় ছিদ্র করে স্টিলের প্লেট বা স্ক্রু বসানো এবং পরবর্তীতে তা অপসারণের জন্য রোগীকে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। ইতিমধ্যে দেড় শতাধিক রোগীর উপর সফলভাবে পরীক্ষিত জৈব-সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন এই উদ্ভাবনটি আগামী দিনে ধাতব ইমপ্ল্যান্টের এক নিরাপদ বিকল্প হিসাবে হাড়ের চিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

৩৬তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৬ সম্পন্ন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২রা ও ৩রা এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী ৩৬তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৬ নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দান সহ ২টি ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ১ম দিন বাদ আছর অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয ওবায়দুল্লাহ। অতঃপর স্বাগত ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন ইজতেমার সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি সূরা মায়েদাহ ৬৭ আয়াত পেশ করে তাবলীগী ইজতেমার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতি সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বিরামহীন ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করে নবী-রাসূলদের রেখে যাওয়া সরল পথের দিকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি ইজতেমায় উপস্থিত সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ও শুভাকাংখীদের প্রতি ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় অবস্থানের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্র নামে ইজতেমা ২০২৬-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতি বারের ন্যায় এবারও ইজতেমার দু'দিন আগ থেকেই কর্মীরা মারকাযে আসতে থাকেন। ফলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পূর্বেই মারকাযের দুই মসজিদে ও ময়দানে দরস ও বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়ে যায়। যা ইজতেমার দিন যোহর পর্যন্ত চলে।

নির্ধারিত বক্তৃতা পর্ব :

অতঃপর রাত দেড়টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বিষয় : তাক্বওয়া মুমিনের প্রকৃত শক্তি)। (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (নারী ও পুরুষের পারস্পরিক পর্দা : সমাজ উন্নয়নের পূর্বশর্ত)। (৩) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর (সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে যুবসমাজের ভূমিকা)। (৪) মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (শী'আ ও আহলে বায়ত সম্পর্কে বিভ্রান্তি নিরসন)। (৫) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের করণীয়)। (৬) 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান (নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে আহলেহাদীছ পেশজীবীদের কর্তব্য)। (৭) 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (রাজনৈতিক ফিৎনা ও বিশৃংখলা : রাসূল (ছা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে মুসলমানের করণীয়)। (৮) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাযীপুরের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন (ঢাকা) (সুন্নাতের গুরুত্ব ও আহলে কুরআনের সংশয়ের জবাব)। (৯) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ (মাল ও মর্যাদার লোভ আদর্শিক সমাজ গঠনের মূল বাধা)। (১০) মুফতী মা'রূফ কাসেমী (ঢাকা) (ছহীহ হাদীছ অনুসরণের গুরুত্ব ও ভুল ধারণার জবাব)। (১১) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ (বিদ'আত ও তার কুপ্রভাব)।

আমীরে জামা'আতের ১ম দিনের ভাষণ : রাত সোয়া ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা শূরা ১৩ আয়াতের আলোকে ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

২য় দিন বাদ ফজর : মূল প্যাণ্ডেলে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (বিষয় : জান্নাতী বান্দার বৈশিষ্ট্য)। একই সময়ে মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে সূরা মুযযাম্মিল ৫ আয়াতের আলোকে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) এবং পূর্ব পার্শ্বস্থ ছোট মসজিদে সূরা হাদীদ ২১-২২ আয়াতের আলোকে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন মারকাযের শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

অতঃপর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে বেলা সোয়া ১১-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করেন (১) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (পাঁচ প্রকার শিরক ও তার ভয়াবহতা) (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদের গুণাবলী) (৩) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (যুবকদের বিপথগামিতার কারণসমূহ ও তার প্রতিকার) (৪) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সমাজ সংস্কারে সার্বিক চেতনা সম্পন্ন নেতা-কর্মীদের অপরিহার্যতা)। (৫) কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা (আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিচয়, লক্ষ্য ও কর্মপন্থা) (৬) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত) (৭) নওদাপাড়া মারকাযের সাবেক ছাত্র মুহাম্মাদ আকমাল (সৎ সাহচর্যের উপকারিতা) (৮) নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আফযাল হোসাইন (বিশুদ্ধ আক্বীদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা)। (৯) মাওলানা ইকবাল কবীর (রিয়ার কুফল)। (১০) আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুদাঊদ (জনসেবায় আল-'আওন-এর ভূমিকা)। (১১) অতঃপর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। (১২) শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন আব্দুল্লাহ আল-মামূন (ঢাকা)।

জুম'আর খুৎবা : ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আ'রাফের ১৭২ আয়াতের আলোকে 'মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব ও পুলছিরাত পার হওয়া' বিষয়ে এবং মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম 'ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ' বিষয়ে ও মহিলা মাদ্রাসার প্যাণ্ডেলে মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম 'আদর্শ নারীর গুণাবলী' বিষয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় তীব্র তাপদাহ থাকা সত্ত্বেও কোন প্যাণ্ডেলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। প্যাণ্ডেলের বাইরে বিভিন্ন স্থানে বসে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী খুৎবা শ্রবণ করেন।

২য় দিন বাদ আছর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত :

জুম'আর ছালাতের পর আছর পর্যন্ত বিরতি থাকে। অতঃপর আছর ছালাতের পর থেকে ভোর ৪-টা ৩৫মিনিট পর্যন্ত নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে, (১) 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম (সুসন্তান গড়ে তোলার উপায়সমূহ) (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (সমাজ সংস্কারে জামা'আতবদ্ধ জীবন ও সংগঠনের গুরুত্ব) (৩) চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর (তৃণমূল পর্যায়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসার : আমাদের দায়িত্ব ও করণীয়) (৪) নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা) (৫) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি

আবুল কালাম (জয়পুরহাট) (আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে ছাত্র ও যুবসমাজের ভূমিকা ও তাদেরকে সম্পৃক্ত করার উপায়)। (৬) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (নবী-রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্য ও তাঁদের দাওয়াতী নীতি) (৭) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) (আহলেহাদীছ আন্দোলনের সমাজ সংস্কারের রূপরেখা)। (৮) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (তাযকিয়া ও তারবিয়ার নীতি সমূহ (৪ ও ১০ এবং বৈশিষ্ট্য সমূহ : ২ ও ৩)।

বাদ এশা বক্তব্য পেশ করেন, (৯) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (ইক্বামতে দ্বীনের প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং দ্বীন কায়েমে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য)। (১০) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ড. মীযানুর রহমান (কাদিয়ানী ও হিজবুত তাওহীদের আক্বীদা)। (১১) সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই (তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ) (১২) নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন (সন্তানের আক্বীদা ও চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার ভূমিকা)। (১৩) খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) (সমাজে দুর্নীতি, সূদ, ঘুষ ও চাঁদাবাজির অবাধ প্রসার : ইসলামে এর ভয়াবহ পরিণতি ও আমাদের করণীয়)। (১৪) নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক মাওলানা সোহাইল আহমাদ (জান্নাতের বিবরণ)। (১৫) নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন (কবরের আযাব)। (১৬) নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম (জাহান্নামের ভয়াবহতা) ও (১৭) হাফেয মাওলানা শামসুর রহমান (ঢাকা) (সামাজিক অবক্ষয় ও তার প্রতিকার (জুয়া, লটারী, দিবস পালন ও যৌতুক প্রথাসহ)।

আমীরে জামা'আতের ২য় দিনের ভাষণ :

ইজতেমার ২য় দিন রাত সাড়ে ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা নূর ৫৫ আয়াত অবলম্বনে দেশে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। এরপর তিনি সকলের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মারকাযে জুম'আর খুৎবারত অবস্থায় প্রবল অসুস্থতার কারণে আমীরে জামা'আতের হঠাৎ ঢলে পড়ে যাওয়ার মর্মান্তিক দৃশ্য লাইভে দেখে দেশ-বিদেশের কর্মীদের মধ্যে যেমন হতাশা তৈরী হয়েছিল, ৩৪ দিন পর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ এবং ১ম ও ২য় রাতে অজস্বীনী ভাষণ দেওয়ায় কর্মীদের মধ্যে তেমনি উচ্ছাস তৈরী হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ!*

প্রস্তাবনা পাঠ : মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রস্তাবনা পাঠ করেন এবং সকলে হাত তুলে তা সমর্থন করেন। প্রস্তাবনা সমূহ নিম্নরূপ-

(১) বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হল 'ইসলাম'। অতএব বাংলাদেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। **(২)** শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সেই সাথে শিক্ষা কারিকুলাম থেকে নাস্তিক্যবাদ, এলজিবিটি, সহশিক্ষাসহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী বিষয়সমূহ অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে। **(৩)** দেশে প্রচলিত বৃটিশ আমলের দীর্ঘসূত্রি বিচারব্যবস্থার বদলে বাদী-বিবাদী ও চাক্ষুস সাক্ষী ভিত্তিক ইসলামী দ্রুত বিচারব্যবস্থা চালু করতে হবে। **(৪)** সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে। ঘুষ-দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। **(৫)** যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মদ-জুয়া, নগ্নতা ও বেহায়াপনা সহ সকল প্রকার অনাচার কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। ইন্টারনেটসহ সকল মিডিয়া ও গণমাধ্যমে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **(৬)** সারাদেশে আলেম-ওলামা এবং দ্বীনী সংগঠনগুলো যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচার করতে পারে, সে জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদ বা মাদ্রাসার উপর যেন কোন মহলের বাধা বা আক্রমণ না আসে, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। **(৭)** এই সম্মেলন মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইস্রাঈলের হিংস্র ও রক্তক্ষয়ী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছে। সেই সাথে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ভূমিকা রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং ওআইসিসহ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে। **(৮)** এই সম্মেলন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অস্বীকারকারী কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

উদ্বোধনপূর্ব বক্তৃতা সমূহ : বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতেমা শুরু হওয়ার ঘোষণা থাকলেও কর্মী ও সুধীগণ আগে থেকেই আসতে শুরু করেন। ফলে ১ম দিন বৃহস্পতিবার বাদ ফজর থেকে মূল প্যাণ্ডেলে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়। যা যোহর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে। এসময় বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে- (১) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান (ছালাতের গুরুত্ব) (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ (দাওয়াতের গুরুত্ব ও দাঈর গুণাবলী) (৩) রাশেদুল ইসলাম (রামাযানের প্রভাব ধরে রাখব কিভাবে?) (৪) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক (আদর্শ পরিবার পরিকল্পনা) (৫) আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক রাক্বীবুল ইসলাম (মানবাধিকার) (৬) ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ এরশাদুল্লাহ (ইস্তিগফার) (৭) নাটোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী (চরমপন্থার ক্ষতিকর দিকসমূহ) (৮) মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলী (সাংগঠনিক জীবনে আনুগত্য) (৯) দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (মৃত্যু পরবর্তী শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ সমূহ) (১০) রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মতীউর রহমান (আধুনিক মিডিয়ায় দাওয়াতের গুরুত্ব) (১১) ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ছবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা) (১২) জামালপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা হাবীবুল্লাহ (যুবজীবনের মরণফাঁদ নেশা) (১৩) জামালপুর-উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ইসমাঈল বিন আব্দুল গণী (মুসলিম উম্মাহ্র অধঃপতনের কারণ) (১৪) যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল আলীম (আমল কবুলের শর্তাবলী) (১৫) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম (দাওয়াতী ময়দানে বাধাসমূহ : আমাদের করণীয়) (১৬) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদ (দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবকদের আত্মত্যাগ) ও (১৭) বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন (ইত্তেবা ও তাক্বলীদ)।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ : ইজতেমার শেষ দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে নওদাপাড়া মারকাযের হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয

ওবায়দুল্লাহর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন। অতঃপর তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী ৩৬তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

১. ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৬ : ইজতেমার আগের দিন ১লা এপ্রিল বুধবার বাদ আছর থেকে রাত সাড়ে ১১-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানান এবং জাগরণীর মাধ্যমে তাওহীদী সমাজ গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া) ও অলিউল্লাহ (রাজশাহী)। জাগরণী পেশ করে মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), তানভীরুয্যামান (মেহেরপুর), রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা), আব্দুল মুন'ঈম (রাজশাহী), কেরামত আলী (পাবনা), রাতুল ইসলাম (রাজশাহী), ওবায়দুল্লাহ (গাইবান্ধা), মীর বখতিয়ার (যশোর), এনামুল হক (নওগাঁ), আব্দুর রহমান, ফরীদুল ইসলাম (গাইবান্ধা), আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ (কুমিল্লা) ও শামীম রেযা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

২. আহলেহাদীছ উদ্যোক্তা মিট-আপ : ইজতেমার ১ম দিন বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর উদ্যোগে আহলেহাদীছ উদ্যোক্তা মিট-আপ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

'পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহিবুল হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ তারেক ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল।

৩. প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় : ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৭-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে 'আন্দোলন'-এর প্রবাসী সংগঠন সমূহের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন, সিঙ্গাপুর প্রবাসী আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া), সঊদী আরব প্রবাসী আতাউল হক (ময়মনসিংহ), কাতার প্রবাসী আব্দুল হক (ঝিনাইদহ) প্রমুখ। অবশেষে অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

৪. শিক্ষক সমাবেশ : ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৮-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা ছফিউল্লাহ ও ঢাকা ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 'ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল'-এর এডিশনাল ডিরেকটর জুনায়েদ মুনীর।

অতঃপর 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড প্রণীত বইয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী অত্র শিক্ষাবোর্ড অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার জন্য ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এতে ১ম স্থান অধিকার করেন রংপুর-দিনাজপুর জোনের কো-অর্ডিনেটর মাওলানা আবু তাহের, ২য় স্থান অধিকার করেন চট্টগ্রাম-কুমিল্লা জোনের কো-অর্ডিনেটর মাওলানা জামীলুর রহমান ও ৩য় স্থান অধিকার করেন জামালপুর-ময়মনসিংহ জোনের কো-অর্ডিনেটর জাহাঙ্গীর আলম। অতঃপর উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হয় ঢাকা জোনের কো-অর্ডিনেটর হাফেয খায়রুল ইসলাম, সাতক্ষীরা জোনের ড. মুহাম্মাদ মুহসিন, বরিশাল জোনের কায়েদ মাহমূদ ইমরান, বগুড়া জোনের আব্দুর রঊফ ও সিলেট জোনের তোফায়েল আহমাদকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'শিক্ষাবোর্ডে'র সচিব জনাব শামসুল আলম এবং সঞ্চালক ছিলেন 'শিক্ষাবোর্ড'-এর সাবেক সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাঊদ।

৫. যুব সমাবেশ : ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুব সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আবদুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ।

যেলা সভাপতি ও দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন (১) রংপুর-পশ্চিম যেলা সভাপতি মতীউর রহমান (২) দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা সভাপতি মীযানুর রহমান (৩) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন (৪) বাগেরহাট যেলা সভাপতি ওবায়দুর রহমান (৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আকরাম হোসাইন (৬) ঢাকা কলেজের সভাপতি মুকাররম হোসাইন (৭) বরিশাল যেলা সভাপতি মা'ছূম বিল্লাহ (৮) চাঁদপুর যেলা সভাপতি

অলিউল্লাহ (৯) কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আজবাহার ও (১০) কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক। সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ।

৬. আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম : ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার বেলা ৩-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** 'পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান (রাজশাহী)-এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত (কুষ্টিয়া)-এর সঞ্চালনায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি অধিবেশনে বিভক্ত সমাবেশের ১ম অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করেন বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণ। অতঃপর ২য় অধিবেশনে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ডা. যুবায়ের ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তারেক আহমাদ (নাটোর), শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক হোসাইন মাহমূদ (সাতক্ষীরা), সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডা. নাজমুছ ছাকিব (সাতক্ষীরা), পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল ওয়াহহাব (জয়পুরহাট) প্রমুখ। অতঃপর বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে বিগত বছরের কার্যক্রমের ভিত্তিতে সাতক্ষীরা, ফেনী, রাজশাহী-সদর, জয়পুরহাট, ঢাকা-দক্ষিণ ও রাজশাহী-পূর্ব এই ৬টি সাংগঠনিক যেলাকে পুরস্কৃত করা হয়।

৭. আল-'আওন-এর ডোনার সমাবেশ : একইদিন শুক্রবার বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী ও ডোনার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর সচিব শামসুল আলম। সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুদাঊদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ যেলা আল-'আওনের সভাপতি ডা. জাহিদুল ইসলাম, বরিশাল যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মা'ছূম বিল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে ২০২৫ বর্ষে ৪২টি কার্যকর যেলার মধ্যে রক্তদানসহ অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যক্রম বিবেচনায় 'নারায়ণগঞ্জ' যেলা কর্মপরিষদকে 'শ্রেষ্ঠ কর্মপরিষদ' হিসাবে মনোনীত করা হয়। এছাড়া ফযলুল হক (সভাপতি, নীলফামারী)-কে 'শ্রেষ্ঠ দায়িত্বশীল' হিসাবে মনোনীত করা হয়।

৮. ইজতেমার পরিচালকবৃন্দ : দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক (২) সাংগঠনিক সম্পাদক (৩) প্রচার সম্পাদক (৪) প্রশিক্ষণ সম্পাদক (৫) সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং (৬) যুববিষয়ক সম্পাদক।

৯. সঞ্চালকবৃন্দ : এবারের ইজতেমায় পর্যায়ক্রমে সঞ্চালক ছিলেন (১) ড. নূরুল ইসলাম (মারকায) (২) আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) (৩) কাযী হারূণুর রশীদ (ঢাকা) (৪) আব্দুল ওয়াদূদ (ঢাকা) (৫) জামীলুর রহমান (কুমিল্লা) (৬) আব্দুল মান্নান (রাজশাহী) (৭) ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর) (৮) অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী) (৯) মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম (মারকায) ও (১০) নাজমুন নাঈম (মারকায)।

১০. প্যাণ্ডেলের মুওয়াযযিনবৃন্দ : (১) খালিদ (সাতক্ষীরা) বৃহস্পতিবার (ফজর); (২) হাফেয হুযায়ফা (ছাত্র, মারকায) যোহর; (৩) আহনাফ মুবাশশির (ছাত্র, মারকায) আছর; (৪) রোকনুযযামান (মেহেরপুর) মাগরিব; (৫) শাহীনুর রহমান (শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ) এশা (৬) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (শিক্ষক, মারকায) ২য় দিন ফজর; (৭) আব্দুল বারী (মুওয়াযযিন, মারকায) জুম'আ; (৮) আরযুল ইসলাম (ছাত্র, মারকায) আছর; (৯) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) মাগরিব; (১০) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) এশা (১১) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (শিক্ষক, মারকায) শেষ দিন শনিবার ফজর।

১১. প্যাণ্ডেলের ইমামগণ : (১) হাফেয মুহাম্মাদ যাকারিয়া (শিক্ষক, মারকায) বৃহস্পতিবার ফজর; (২) ক্বারী আবু সীনা (শিক্ষক, মারকায) যোহর; (৩) হাফেয মশীউর রহমান (শিক্ষক, মারকায) আছর; (৪) ক্বারী আব্দুল আঊয়াল (শিক্ষক, মক্তব বিভাগ, মারকায) মাগরিব; (৫) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, এশা ও ২য় দিন ফজর এবং জুম'আ (৮) ক্বারী আব্দুর রহীম (শিক্ষক, মক্তব বিভাগ, মারকায) আছর; (৯) হাফেয আব্দুল্লাহ আল-আল-মা'রূফ (শিক্ষক, মারকায) মাগরিব; (১০) হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (সহ-পরিচালক, হিফয-মক্তব বিভাগ, মারকায) এশা; (১১) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (শিক্ষক, হিফয বিভাগ, মারকায); শেষ দিন ফজর।

১২. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত : (১) হাফেয ছাকিবুল হাসান (ছাত্র, মারকায বৃহস্পতিবার বাদ ফজর); (২) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (শিক্ষক, হিফয বিভাগ, মারকায; বাদ আছর) (৩) হাফেয আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (ছাত্র, মারকায; বাদ মাগরিব) (৪) ক্বারী আব্দুল আঊয়াল (শিক্ষক, মারকায; বাদ এশা) (৫) হাফেয আহনাফ মুবাশশির (শুক্রবার বাদ আছর); (৬) হাফেয নাজমুছ ছাকিব (গোপালগঞ্জ; বাদ মাগরিব) (৭) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর; বাদ এশা)।

১৩. জাগরণী : আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য (১) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) (২) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) (৩) তানভীরুয্যামান, (ঐ) (৪) রোকনুয্যামান, (সাতক্ষীরা) (৫) আব্দুল্লাহ আল-মামূন (ঐ) (৬) কেরামত আলী (পাবনা) (৭) আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ (কুমিল্লা) (৮) ওবায়দুল্লাহ (গাইবান্ধা) (৯) মীর বখতিয়ার (যশোর) (১০) এনামুল হক (নওগাঁ) (১১) আবূবকর (রাজশাহী) ও (১২) তাওহীদ (সাতক্ষীরা)। (১৩) হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায)।

১৪. প্যাণ্ডেল : (১) মূল প্যাণ্ডেল ছিল নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দান। যার আয়তন ছিল ৩০০×৪৬৫ ফুট। (২) তার পশ্চিম-উত্তর পার্শ্বে ছিল বৃহদায়তন খাদ্য প্যাণ্ডেল ও পৃথক খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্যাণ্ডেল। যেখানে স্বল্প মূল্যে সকালের নাশতা এবং দুপুর ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। (৩) তাছাড়া উত্তর-পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের থাকার ব্যবস্থা। **(৪) মহিলা প্যাণ্ডেল :** আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর (বালিকা শাখা) ময়দানে ইজতেমার মহিলা প্যাণ্ডেল করা

হয়। যার আয়তন ছিল ১২০×২০০ ফুট। সেখানে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে পৃথকভাবে মহিলাদের প্রোগ্রাম হয়। (৫) এছাড়াও ছিল মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবন ময়দানে বিশেষ প্যাণ্ডেল। যেখানে ইজতেমার বিভিন্ন প্রোগাম বাস্তবায়িত হয়। প্রতিটি প্যাণ্ডেল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

১৫. বুক স্টল : ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের উত্তর পার্শ্বে ৩২টি ও মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ গেট সংলগ্ন ১টি বুক স্টল ছিল।

১৬. আল-'আওন : মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বুক স্টল সংলগ্ন বিশেষ স্টলে আল-'আওন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ১৪৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৫২ জন ডোনার তালিকাভুক্ত হন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্র সহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৭. যরূরী চিকিৎসা কেন্দ্র : মূল প্যাণ্ডেলের উত্তর পার্শ্বে যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র চিকিৎসকগণ সেখানে ফ্রী চিকিৎসা প্রদান করেন। পাশাপাশি পৃথক বুথে হোমিও চিকিৎসকদের মাধ্যমেও চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়।

১৮. দেওয়াল পত্রিকা : তাবলীগী ইজতেমা'২৬ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' মারকায শাখার পক্ষ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা' নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯. ফৎওয়া বুথ : গতবারের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের উত্তর পার্শ্বে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'দারুল ইফতা'র সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। ইজতেমার ১ম দিন বাদ আছর থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এবং ২য় দিন বাদ আছর থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

২০. নিরাপত্তা : ইজতেমা ময়দানের ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। সেই সাথে ৩টি গেইটে ছিল ১০টি মেটাল ডিটেকটর। সংগঠনের ৬০০ জন স্বেচ্ছাসেবক দু'দিন আগে থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণের নিয়মিত তদারকি।

২১. যানবাহন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বিভিন্ন যেলা থেকে মুছল্লীগণ বাস, ট্রেন, মাইক্রো, বিমান ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় আগমন করেন। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মোট বাসের সংখ্যা ২২১টি ও মাইক্রোর সংখ্যা ২২টি। সবচেয়ে বেশী বাস আসে সাতক্ষীরা থেকে (৫৫টি) এবং বগুড়া থেকে ৪৫টি। এছাড়া সঊদী আরব, সিঙ্গাপুর, কাতার সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সদ্য দেশে আগত অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন। উল্লেখ্য এবছর তেল সংকটের কারণে অনেক যেলা থেকে বাস রিজার্ভ করা আসা সম্ভব হয়নি।

২২. সাইকেল উপহার : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও সাইকেল যোগে ইজতেমায় আগমন করার কথা ছিল সাতক্ষীরা যেলার তালা উপযেলার বর্তমানে মানিকহার গ্রামের আব্দুল বারীর (৬৮)। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত মোট ২৪ বার তিনি বাইসাইকেল যোগে সাতক্ষীরা থেকে প্রায় ৩০০ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে রাজশাহী তাবলীগী ইজতেমায় আসেন। কিন্তু তাকে ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয় যে, তাকে সাইকেল উপহার দেয়া হবে। তাই তিনি বাস যোগে আসেন। অতঃপর ইজতেমার ২য় দিন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের রাতের ভাষণের পূর্বে ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার পক্ষ থেকে ইজতেমার স্টেজে তাকে একটি নতুন সাইকেল উপহার দেয়া হয়।

২৩. সোনামণি র‍্যালি : তাবলীগী ইজতেমা'২৬ উপলক্ষে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ১লা এপ্রিল বুধবার বাদ আছর সোনামণি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

(গত সংখ্যার পর)

৫ই রামাযান ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দক্ষিণ-বাগুা, ভোলা : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ-বাগুা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম।

১০ই রামাযান ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বগুড়া : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ছোট বোলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ।

১০ই রামাযান ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার রূপগঞ্জ জি. কে একাডেমীতে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ. ন. ম সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর।

১১ই রামাযান ১লা মার্চ রবিবার লালপুর, নাটোর : অদ্য বাদ আছর যেলার লালপুর থানাধীন বামনগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম।

১১ই রামাযান ১লা মার্চ রবিবার পাঁচদোনা, নরসিংদী : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরের পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন।

১২ই রামাযান ২রা মার্চ সোমবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের কাউতলীস্থ ফুডহাট রেস্টুরেন্ট ও পার্টি সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এমরান হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

১৫ই রামাযান ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার চাঁদপুর : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আল-ইনছাফ একাডেমীর ৭ম তলার দাওয়াহ সেন্টারে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর

কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার।

১৬ই রামাযান ৬ই মার্চ শুক্রবার কুলাউড়া, মৌলভীবাজার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন মসজিদুত তাওহীদ-এ মৌলভীবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছাদিকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

১৬ই রামাযান ৬ই মার্চ শুক্রবার পটুয়াখালী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের আস-সুন্নাহ মাদ্রাসা কমপ্লেক্স মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবূদাঊদ।

১৬ই রামাযান ৬ই মার্চ শুক্রবার কক্সবাজার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের বাজার ঘাটাস্থ হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান।

১৬ই রামাযান ৬ই মার্চ শুক্রবার পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম : অদ্য বাদ জুম'আ নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

১৭ই রামাযান ৭ই মার্চ শনিবার কুমিল্লা : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

১৭ই রামাযান ৭ই মার্চ শনিবার খুলনা-দক্ষিণ : অদ্য বা'দ যোহর যেলা শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে খুলনা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

১৭ই রামাযান ৭ই মার্চ শনিবার বাগেরহাট : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

১৭ই রামাযান ৭ই মার্চ শনিবার, সিলেট : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের শাহী ঈদগাহ সংলগ্ন হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে সিলেট-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট দক্ষিণ-এর সভাপতি জাবের আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

১৮ই রামাযান ৮ই মার্চ রবিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বেলা ১১-টায় মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর শহরের হাতেম খান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর ও অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

১৮ই রামাযান ৮ই মার্চ রবিবার তেরখাদা, খুলনা-উত্তর : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার তেরখাদা উপযেলাধীন তেরখাদা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

১৯শে রামাযান ৯ই মার্চ সোমবার গোপালগঞ্জ : অদ্য বাদ যোহর যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন বর্ষাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

২৬শে রামাযান ১৬ই মার্চ সোমবার মাগুরা : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন ঘোড়ানাছ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

মৃত্যু সংবাদ

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তালেবুদ্দীন মাস্টার (৯০) গত ১১ই মার্চ রোজ বুধবার সকাল ১০-টা ২০মিনিটে বার্ধক্য জনিত কারণে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন* । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৭ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। এদিন রাত সোয়া ৯-টায় তার নিজগ্রাম যেলার জলঢাকা থানাধীন গোলমুণ্ডা ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মোকছেদ আলীসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. রাজশাহীর অচিনতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সেক্রেটারি হোমিও ডাঃ মোঃ মোবারক হোসেন (৬২) গত ৩১শে মার্চ মঙ্গলবার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান।

পরদিন সকাল ৭-টায় বহরমপুর মোড় সংলগ্ন ঈদগাহ ময়দানে তার ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সকাল ৭-টা ৪৫ মিনিটে নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় মারকাযে তার ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অতঃপর বেলা ১১-টায় তার গ্রামের বাড়ী তানোর উপযেলার পারিশো গ্রামের ঈদগাহ ময়দানে তার ৩য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ইমামতি করেন তার ছেলের শ্বশুর 'আন্দোলন'-এর সাতক্ষীরা যেলার পাটকেলঘাটা উপযেলার সাবেক দায়িত্বশীল জনাব মুহাম্মাদ খায়রুল আনাম। অতঃপর তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি 'আন্দোলন'-এর শুভাকাংখী ছিলেন এবং মাসিক আত-তাহরীকে তার ৫টি কবিতা বের হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : একদল নারী সার্বিক নিরাপত্তা থাকা অবস্থায় মাহরাম ছাড়া ফরয হজ্জে যেতে পারবে কী?

-কাওছার আহমাদ, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

উত্তর : স্বামীর অনুমতি ও সার্বিক নিরাপত্তা থাকলে নারীরা নারীদের কাফেলার সাথে ফরয বা নফল যে কোন হজ্জ আদায়ে যেতে পারবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ওছমান ও আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে রাসূল (ছাঃ)-এর আটজন স্ত্রী মাহরাম ছাড়া হজ্জে গমন করেছিলেন *(বুখারী হা/১৮৬০; মুসনাদুল ফারূক ১/২৯৯; তোহফাতুল আশরাফ হা/১০৩৮)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'রাস্তার নিরাপত্তার শর্তে বিশ্বস্ত নারীদের সাথে নারীর সফর জায়েয হওয়ার ব্যাপারে অধ্যায়ের প্রথম হাদীছে দলীল রয়েছে। কারণ এতে যেমন ওমর, ওছমান, আব্দুর রহমান বিন 'আওফ ও নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের ঐক্যমত রয়েছে, তেমনি অন্যান্য ছাহাবীগণও কোন বিরোধিতা করেননি *(ফাৎহুল বারী ৪/৭৬; মির'আতুল মাফাতীহ ৮/৩৩৬)*। উক্ত হাদীছের শিরোনামে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, নারীদের নিরাপত্তার শর্তে মাহরাম ছাড়া হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়েয *(মুসনাদুল ফারূক ১/১৯৯)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) হজ্জের ক্ষেত্রে পাথেয় ও বাহন শর্ত করেছেন মাহরাম শর্ত করেননি। সুতরাং নিরাপত্তার শর্তে অন্যান্য স্বাধীন নারীর সাথে মাহরাম ছাড়া হজ্জে যেতে পারবে *(কিতাবুল উম্ম ২/১২৭)*। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'নারীরা একদল নারীর সাথে হজ্জে যেতে পারবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/২২৯)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, ফরয হজ্জ পালনের জন্য মাহরাম শর্ত নয়। সে নারী জামা'আতের সাথে যাবে বা যে কাফেলায় পূর্ণ নিরাপত্তা আছে তাদের সাথে যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/২২৯)*।

আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বলেন, একদিন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তার কাছে একজন এসে দরিদ্রতার অভিযোগ করল। এরপর আরেকজন এসে রাস্তায় ডাকাতির অভিযোগ করল। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আদী! তুমি কি হীরা দেখেছ? (কূফার একটি প্রসিদ্ধ শহর যা বর্তমানে ইরাকের একটি প্রদেশ) যদি তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাক তাহ'লে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একজন মহিলা হীরা থেকে একাকী মক্কায় গমন করবে এবং কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফ করবে, অথচ এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকে ভয় করবে না *(বুখারী হা/৩৫৯৫; মিশকাত হা/৫৮৫৭)*। উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, উক্ত হাদীছে কেবল ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি বরং নারীদের নিরাপত্তার শর্তে কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/৬১৩; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৫/২৪-২৬)*। তবে শায়েখ ওছায়মীন, শায়েখ বিন বায ও পূর্ববর্তী একদল বিদ্বান নারীদের মাহরাম ছাড়া বাইরে বের হওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীছগুলোর প্রকাশ্য অর্থকে গুরুত্ব দিয়ে মাহরাম ছাড়া হজ্জ সম্পাদন করাকে নাজায়েয বলেছেন। সুতরাং নারী মাহরাম ছাড়া সম্পাদন করতে পারলেও তাদের জন্য উত্তম ও নিরাপদ হ'ল মাহরাম সাথে নিয়ে হজ্জ করা *(ছহীহাহ হা/৩০৬৫; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬১/২৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৭/৪৮)*।

প্রশ্ন (২/২৮২) : বিবাহের পূর্বে অতীত সম্পর্কের কথা অস্বীকার করলেও পরে স্ত্রীর একাধিক অবৈধ সম্পর্কের অকাট্য প্রমাণ পান স্বামী। বর্তমানে স্ত্রী অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী হ'লেও স্বামীর আত্মমর্যাদা তা মেনে নিতে বাধা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় শারঈ ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীর করণীয় কী?

-আব্দুল হাফীয, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহপূর্ব গুনাহগুলো প্রকাশ করে স্ত্রী চরম ভুল করেছে। সে নিজের পাপের কথা গোপন রাখলে আল্লাহও গোপন রাখতেন। এক্ষণে অবশ্যই স্ত্রীকে তার পূর্ব পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে। তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে তওবার পর সে পবিত্র হিসাবে গণ্য হবে। বিদ্যমান অবস্থায় স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে শারঈ কোন বাধা নেই। তবে স্বামী যদি একান্তই মানসিকভাবে মেনে নিতে না পারেন সেক্ষেত্রে তালাক দিতে পারেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৫/৩২০)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : আমি বিভিন্ন সময়ে জাগতিক নানা কারণে পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে একাধিকবার মিথ্যা কসম খেয়েছি। এ কারণে আমাকে কি প্রতিটি কসমের জন্য পৃথক পৃথক কাফফারা দিতে হবে? নাকি সকল পাপের কথা স্মরণ করে তওবা করাই যথেষ্ট হবে?

-শফীকুল ইসলাম খান, সিলেট।

উত্তর : কুরআন স্পর্শ করে মিথ্যা কসম খাওয়া হারাম। যে ব্যক্তি কুরআনের উপর হাত রেখে মহান আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খেল, সে এক মহাপাপে লিপ্ত হ'ল। আর এটিই হ'ল ইয়ামীনে গামুস, যা কসমকারীকে জাহান্নামের আগুনে নিমজ্জিত করে। এক্ষেত্রে তার উপর তওবা ও ইস্তিগফার করা আবশ্যক। তবে কিছু বিদ্বানের মতে এর জন্য তাকে একবার কসমের কাফফারাও দিতে হবে। সেই কাফফারা হ'ল- একজন দাস মুক্ত করা, অথবা দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা সে সাধারণত তার পরিবারকে খাওয়ায় অথবা তাদের বস্ত্র দান করা। যদি এই তিনটির কোনোটিই করতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে তিন দিন ছিয়াম পালন করতে হবে *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন পার্ক বা রিসোর্টে শিক্ষা সফর করা হয়। কিন্তু পার্কে বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি থাকায় সেখানে শিক্ষা সফর করা যাবে কি?

-মেহেদী হাসান মা'রূফ, ঢাকা।

উত্তর : পার্ক বা রিসোর্টগুলোতে বৈধ বিনোদনের জন্য বা শিক্ষা সফরে যাওয়া জায়েয, যদি না ভাস্কর্যগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বা অন্য কোন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্য না থাকে। কিন্তু যদি মূর্তি, ভাস্কর্য-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এগুলোর সাথে ছবি তোলা এবং হারাম বিনোদন, অশ্লীলতা-বেহায়াপনার সাথে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে, তবে সেখানে যাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : আমি একজন পালিত সন্তান। ১ মাস বয়সে আমার বর্তমান পিতা-মাতা আমাকে লালন-পালন করে আসছেন। আমার প্রকৃত বংশপরিচয় আমাদের কারও জানা নেই। বর্তমানে আমার জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সনদসহ সকল দাফতরিক নথিতে তাদের নামই পিতা ও মাতা হিসাবে সংরক্ষিত আছে। এরূপ নিরূপায় অবস্থায় আমার পাপ হবে কি?

-আখি মনি, কক্সবাজার।

[আরবীতে সুন্দর ও ইসলামী নাম রাখুন! (স.স.)]

উত্তর : এমতাবস্থায় গুনাহগার হবে না। বিশেষত উক্ত পালনকারী পুরুষ ও নারী যে প্রকৃত বাবা-মা নন এ বিষয়ে উভয় পক্ষ স্পষ্ট থাকলে এবং তা অন্যদের অবগতিতে থাকলে কেবল দাফতরিক নথির কারণে তাকে গুনাহগার হ'তে হবে না ইনশাআল্লাহ। কেননা এটি বাধ্যগত অবস্থা *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; ছহীহুল জামে' হা/১৮৩৬)*। তবে সংশোধনের সুযোগ থাকলে বা বিকল্প কোন পন্থা থাকলে তা করে নেয়া উত্তম।

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তিকে তার জন্মদাতা পিতা ব্যতীত অন্য কোন পিতার দিকে সম্বন্ধিত করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের পালক পুত্রদের তিনি তোমাদের (আসল) পুত্র করেননি; এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন' *(আহযাব ৩৩/৪)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো' *(আহযাব ৩৩/৫)*। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এটি বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত লাভের আগেই যায়েদ বিন হারিছাকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডাকা হ'ত। এই অবস্থা চলতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন, 'তোমাদের পালক পুত্রদের তিনি তোমাদের পুত্র করেননি' *(আহযাব ৩৩/৪)*। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পালক সন্তান বানানোর প্রথা বাতিল করে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, কেউ কাউকে পালক গ্রহণ করলেও তার পিতার পরিচয়েই তাকে ডাকতে হবে। এর মাধ্যমে মানুষকে সত্য গোপন বা পরিবর্তন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের হক বা অধিকার নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়েছে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১০/১২১-১২২)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : বর্তমান ফিৎনা-সংকুল সময়ে নারীরা পর্দা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে কিভাবে দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করবে এবং ফিৎনার আশঙ্কা থাকলে গায়ের মাহরাম পুরুষ শিক্ষকের কাছে সরাসরি বা অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি-না?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : ইসলামী জ্ঞান অর্জন একটি ইবাদত। এর মাধ্যমে মুসলিমরা মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে এবং পরকালে আম্বিয়া, ছিদ্দীকীন, শুহাদা ও ছালেহীনদের সাথে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থানের আশা রাখে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আনছার মহিলারা কতই না উত্তম! লজ্জা তাদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে বাধা দিতে পারেনি' *(মুসলিম হা/৩৩২; আবুদাউদ হা/৩১৬)*। প্রয়োজনে গায়রে মাহরাম শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয। তবে সেক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্ত হ'ল পূর্ণ পর্দা ও হিজাবের বিধান পালন করা *(নূর ২৪/৩১)*, লজ্জাস্থান হেফাযত করা, ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলা, কমনীয় সুরে কথা না বলা, একান্তে না থাকা, নারী-পুরুষের অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ এড়িয়ে চলা, অনলাইনে ক্যামেরা অফ রাখা এবং প্রয়োজনে মাহরাম বা একজন বিশ্বস্ত নারীর উপস্থিতি থাকা *(আহযাব ৩৩/৩২)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : হজ্জ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কারো যদি এমন ঋণ থাকে যে তা পরিশোধ করতে তার আজীবন লেগে যাতে। এই ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয কি?

-আব্দুল্লাহিল বাকী, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : যদি কোন ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা আবশ্যিক হয়, তাহ'লে হজ্জের উপর ঋণ পরিশোধ প্রাধান্য পাবে। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার আগেই ঋণ হয়েছে। কিন্তু যদি তা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হয়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি মনে করে যে, ঋণ পরিশোধের মেয়াদে সে তা পরিশোধ করতে পারবে এবং তার কাছে হজ্জের জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদিও রয়েছে, তাহ'লে ঋণ থাকা সত্ত্বেও তার উপর হজ্জ ফরয হবে। আর যদি সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, তাহ'লে ফরয হবে না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৮৩)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : মসজিদের মাইকে কি ঈদের তাকবীর দেওয়া যাবে?

-গোলাম মুর্তাযা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নিয়তে মাইকে তাকবীর বলা যাবে। আবূ হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রাঃ) যিলহজ্জের (প্রথম) দশ দিন বাজারের দিকে বের হ'তেন। তাঁরা সেখানে তাকবীর ধ্বনি দিতেন এবং মানুষও তাঁদের সাথে তাকবীর বলত। তাঁরা কেবল এই তাকবীরের উদ্দেশ্যেই বাজারে আসতেন *(ইরওয়া হা/৬৫১)*। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) তাকবীরের জন্য কাউকে নির্ধারণ করাতে কোন বাধা নেই বলে মতপ্রকাশ করেছেন। কারণ উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ ও তা প্রকাশ করা ছাহাবীদের আমল। যাতে গাফেল বা বিস্মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় *('মাজমূ' ফাতাওয়া (১৩/৯৮৭)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : পুকুরে চাষ করা মাছের যাকাত দিতে হবে কি এবং যদি দিতে হয় তাহ'লে কিভাবে দিতে হবে?

-আব্দুল করীম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : সরাসরি মাছের কোন যাকাত নেই। তবে চাষ করা মাছের বিক্রিত মূল্য এবং পুকুরে থাকা মাছের আনুমানিক মূল্য ধরে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং তা নিজ মালিকানায় এক বছর থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। ওমর ইবনে

আব্দুল আযীয (রহঃ) ওমানে তাঁর নিযুক্ত প্রশাসক নিকট লিখেছিলেন যে, 'মাছের ওপর কোন কর বা যাকাত গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না এর মূল্য দুইশত দিরহাম'। বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান বলেন, 'আমার জানা মতে তিনি এটাও বলেছিলেন যে, 'যখন এটি (মাছের মূল্য) দুইশত দিরহামে পৌঁছবে, তখন তা থেকে যাকাত গ্রহণ কর' *(কাসেম বিন সাল্লাম, আল-আমওয়াল হা/৮৯০)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : ইসলামে প্রাণীর ছবি বা মূর্তি রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু ছোট বাচ্চাদের খেলার জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের পুতুল বা প্লাস্টিকের খেলনা (মানুষ বা প্রাণীর আকৃতির) পাওয়া যায়। শিশুদের বিনোদন বা মেধা বিকাশের উদ্দেশ্যে কি এসব পুতুল কিনে দেওয়া যাবে? ইসলামী শরী'আতে শিশুদের জন্য এ ধরনের খেলনা ব্যবহারের সুযোগ আছে কি?

-আশরাফুল ইসলাম, ধানমণ্ডী, ঢাকা।

উত্তর : শিশুদের খেলার জন্য সাময়িক ব্যবহার্য খেলনা পুতুল ব্যবহার করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪১৫; ইবনু হাযম, মুহাল্লা মাসআলা নং ১৯১০; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১২/১২১)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আর আমার কিছু সাথীও আমার সাথে খেলা করত। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবেশ করতেন তখন তারা আত্মগোপন করত। কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন, অতঃপর তারা আমার সাথে খেলত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৩)*। ইমাম নববী বলেন, মেয়েদের খেলনার বিষয়টি স্বতন্ত্র। কারণ এ ব্যাপারে ছাড় রয়েছে। খেলনাটি মানবাকৃতির হৌক বা প্রাণীর আকৃতির হৌক, দেহধারী হৌক বা দেহহীন হৌক, প্রাণীকুলের মধ্যে তার সাদৃশ্য থাক বা না থাক যেমন দু'ডানা ওয়ালা ঘোড়া *(ফাৎহুল বারী ১০/৫২৭; তোহফা ৫/৩৫০)*। আয়েশা (রাঃ) মাটি দিয়ে নিজ হাতে এই পুতুলগুলো বানিয়েছিলেন। অতএব এভাবে মাটির পুতুল তৈরি করে তাকে কাপড় পরানো ও সেবা-যত্ন করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সন্তান প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এতে দোষ নেই। অবশ্য একদল বিদ্বান ছবি ও মূর্তি নিষিদ্ধের আম হাদীছের উপর ভিত্তি করে যাবতীয় আকৃতিবিশিষ্ট খেলনা ব্যবহার করা হারাম বলেছেন *(ফাৎওয়াশ শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম ১/১৮০ - ১৮৩; তুয়াইজিরী, ই'লানুন নাকীর ৯৭ পৃ.)*। তবে আম হাদীছের বিপরীতে খাছ হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় ছোট শিশুদের জন্য যেকোন আকৃতির খেলনা ব্যবহার করা জায়েয *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৫০০; ক্বারযাভী, আল-হালাল ওয়াল হারাম ১০৩-১০৪ পৃ.)*। উল্লেখ্য যে, এসব খেলনা কেবল খেলনা হিসাবেই ব্যবহার করা যাবে। শোকেসে বা অন্য কোথাও প্রদর্শনীর জন্য তা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ *(বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'ছবি ও মূর্তি' বই)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : আমি এ্যাম্বুলেন্স চালাই। এজন্য প্রায় প্রতিদিন রোগী নিয়ে আমাকে দূর-দূরান্তে যেতে হয়। এক্ষেত্রে আমি নিয়মিত ক্বছর ছালাত আদায় করবো কি?

-মোশাররফ হোসাইন, মাদারীপুর।

উত্তর : একজন গাড়ি চালক যদি প্রতিদিন ক্বছর করার সমপরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করেন তাহ'লে তিনি শরী'আতের দৃষ্টিতে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবেন। তিনি তার সফর ও কর্মকালীন সময়ে চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতগুলো (যোহর, আছর ও এশা) ক্বছর করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে জমা (যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা একত্রে আদায়) করতে পারবেন। এমনকি যদি এই সফর প্রতিদিনও হয়। তার জন্য ছালাত পূর্ণ করার চেয়ে ক্বছর করাই উত্তম *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/১৯০; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : আমার বিয়েতে প্রথমে আমি রাযী ছিলাম না, তবে কঠোরভাবে বিরোধিতাও করিনি। এভাবে বিয়ের দুই বছর কেটে গেলেও আমি আমার স্ত্রীকে মেনে নিতে পারছি না এবং এতে আমি প্রচণ্ডভাবে মানসিক অস্বস্তিতে আছি। এমতাবস্থায় মানসিক প্রশান্তি পেতে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : দাম্পত্য জীবনে স্থিতিশীলতা ও মানসিক প্রশান্তি আনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপায়- (১) বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তা ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে ধীরে ধীরে উন্নতির চেষ্টা করা। (২) আল্লাহভীতি এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানসিক স্থিরতা আনার চেষ্টা করা। (৩) ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা এবং মানুষ হিসাবে স্ত্রীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ কর। আর যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, তবে হ'তে পারে তোমরা কোন বস্তু অপসন্দ করছো, কিন্তু আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিন নারীকে (নিজের স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার কোন একটি আচরণ বা চরিত্রে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তার অন্য কোন আচরণে সে সন্তুষ্ট হবে' *(মুসলিম হা/১৪৬৯)*। তবে স্বামী তাকে কোনভাবেই মেনে নিতে না পারলে সে তাকে তালাক দিতে পারে বা তাকে রেখেই আরেকটি বিবাহ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যদি তারা পৃথক হয়ে যায়, আল্লাহ উভয়কে নিজের অনুগ্রহ থেকে অভাবমুক্ত করে দেবেন *(নিসা ৪/১৩০)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : কোন নারীর ইদ্দত পালনকালীন যদি তার পিতা মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে তিনি পিতার লাশ দেখার জন্য সেখানে যেতে পারবেন কি?

-তাসনীম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য প্রয়োজনে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয। বিশেষ করে নিজের পিতার লাশ দেখতে যাওয়া বা জানাযায় শরীক হওয়া একটি শরী'আত সম্মত প্রয়োজন হিসাবে গণ্য, যার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য বৈধ। তবে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত পালন করা যরূরী। যেমন বের হওয়ার সময় সব ধরনের সাজসজ্জা বর্জন করা, পর্দার বিধান মেনে বের হওয়া এবং কাজ শেষে সেই বাড়িতে ফিরে আসা যেখানে তিনি ইদ্দত পালন করছিলেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/১৬৭)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : কাপড় ধোয়ার পরেও যদি বীর্য না ওঠে

তাহ'লে ঐ কাপড় পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নো'মান, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে। বীর্য কাপড় থেকে তুলে ফেলবে বা ধুয়ে ফেলবে। চিহ্ন দেখা না গেলে পানি ছিটিয়ে দিবে। এটাই যথেষ্ট হবে *(নববী, শরহু মুসলিম ৩/১৯৮; ফাৎহুল বারী ২/৩৩২); ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩৮১)*। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হুমাম বিন হারেছ একদিন আয়েশা (রাঃ)-এর মেহমান হন। এমতাবস্থায় সকালে তিনি কাপড় ধুতে থাকলে আয়েশা (রাঃ)-এর দাসী সেটা দেখেন এবং তাঁকে সেটা অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে ফেলবে। আর না দেখা গেলে স্থানটিতে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষা দিয়ে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন' *(মুসলিম হা/২৮৮; আবুদাঊদ হা/৩৭১)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : বাজারে কালো মেহেদী নামে যে মেহেদী পাওয়া যায়, তা মেহেদী হ'লেও চুল-দাড়ি কালোর কাছাকাছি রঙ হয়। এটি ব্যবহার করা যাবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : পাকা চুল বা দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করে রং পরিবর্তন করা জায়েয। তবে শর্ত হ'ল তা যেন সরাসরি কালো রঙের না হয়। যখন আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং তাঁর মাথা ও দাড়ির চুল ধবধবে সাদা ছিল, তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে রঙ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, 'তবে তোমরা কালো রঙ পরিহার কর' *(মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শেষ যামানায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কবুতরের বুকের মত কালো রঙ দিয়ে চুল/দাড়ি রঞ্জিত করবে; তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না' *(আবূদাঊদ হা/৪২১২; মিশকাত হা/৪৪৫২; ছহীহুল জামে' হা/৮১৫৩)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : জনৈক আলেম তার বক্তব্যে বলেছেন, সুপারী গাছ কেটে ফেলতে হবে। তার এই বক্তব্য কতটুকু শরী'আতসিদ্ধ?

- হেলালুদ্দীন, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : সুপারী হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল নেই। সুতরাং গাছ কেটে ফেলতেই হবে এমন ধারণা ভুল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। তিনি আরো বলেন, 'তুমি বলে দাও, আমার নিকট যেসব বিধান অহি করা হয়েছে, সেখানে ভক্ষণকারীর জন্য আমি কোন খাদ্য হারাম পাইনি যা সে ভক্ষণ করে, কেবল মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এগুলি নাপাক বস্তু' *(আন'আম ৬/১৪৫)*। আর খাদ্যসমূহের বিষয়ে মূল বিধান হ'ল সেগুলো হালাল হ'তে হবে। এ বিষয়ে চারটি ফিক্বহী মাযহাবের মধ্যে একমত রয়েছে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ'ল ফাতাওয়া ২১/৫৩৮)*। তবে সুপারীকে জাগ দিয়ে পচানোর পর যদি তাতে মাদকতা আসে, তাহ'লে মাদকতার কারণে তা খাওয়া হারাম হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই মাদক এবং প্রত্যেক মাদকই হারাম' *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। এছাড়া সুপারী নিয়মিত বা অতিরিক্ত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। এটি মুখের ক্যান্সারসহ হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনীর সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। এটি দাঁত ও মাড়ির স্থায়ী ক্ষতি করে। তাই সুপারী বর্জন করাই উত্তম।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : জনৈক ব্যক্তি জীবিত থাকাবস্থায় ছেলে-মেয়েকে সমান অংশে সম্পদ লিখে দিয়েছেন। তার এই কাজ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে। না হ'লে এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-আব্দুর রহীম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত লিখে দেয়া শরী'আত সম্মত হয়নি। কারণ মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পাবে। উত্তরাধিকার সম্পদ মৃত্যুর পরে বণ্টন হওয়াই ইসলামী শরী'আতের বিধান, যা সকলের জন্য কল্যাণকর। মৃত্যুর পূর্বে পিতা-মাতা সন্তানদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সকলকে শরী'আতে বর্ণিত বণ্টননামা অনুযায়ী প্রদান করতে হবে *(বুখারী হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯)*। পিতার মৃত্যুর পরে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী যাতে বণ্টন করা হয়, সে মর্মে বণ্টননামা অছিয়ত আকারেও লিখে রাখতে পারেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/১৯৩)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : আমার পিতা যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা আদায় করেননি। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এমতাবস্থায় পিতাকে যাকাত আদায় না করার পাপ থেকে রক্ষা করতে সন্তানের করণীয় কি?

-আতীক হাসান, মুজিবনগর, মেহেরপুর।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির যদি নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে ওয়ারিছদের উপর ওয়াজিব হ'ল তাদের মৃত পিতার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করা। কেননা যাকাত তার যিম্মায় একটি ঋণ হিসাবে গণ্য, যা উত্তরাধিকার বন্টনের আগেই তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে পরিশোধ করা আবশ্যক। আর তা আদায় করতে হবে সেই বছরগুলোর যাকাত হিসাব করে কেটে রাখার মাধ্যমে, যে বছরগুলোতে তিনি যাকাত আদায় করেননি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৪৯৩)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর' *(নিসা ৪/১১-১২)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : সঊদী আরবে কোন কোন খতীব ছাহেব খুৎবার শেষের দিকে দু'হাত তুলে মুনাজাত করেন। খুৎবার মধ্য এভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করার বিধান কি?

-সাইফুল্লাহ, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : জুম'আর খুৎবায় হাত তোলা শরী'আত সম্মত নয়। ইমামের জন্যও নয়, মুক্তাদীদের জন্যও নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটি করেননি এবং তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও এমন ছিল না। তবে ইমাম যদি জুম'আর খুৎবায়

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁর ও মুক্তাদীদের জন্য হাত তোলা শরী'আত সম্মত। কেননা নবী করীম (ছাঃ) যখন জুম'আর খুৎবায় বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ করেছিলেন, তখন তিনি হাত তুলেছিলেন এবং উপস্থিত লোকেরাও তাদের হাত তুলেছিলেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৪৯-৫০; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ১/৪২৭)*। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ ছাড়া অন্য কোন কারণে জুম'আর খুৎবার সময় হাত তোলা যাবে না' *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২৪/০২)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ব্যবহার করে কাবা শরীফ বা জান্নাত-জাহান্নামের কাল্পনিক দৃশ্য অনুভব করার চেষ্টার শারঈ বিধান কী?

-আহমাদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ভি আর (VR) প্রযুক্তির মাধ্যমে কা'বা, মসজিদুল হারাম, জান্নাত বা জাহান্নামের দৃশ্য দেখার অর্থ সেটি বাস্তব দেখা নয়, বরং একটি কাল্পনিক অভিজ্ঞতা। শরী'আতের দৃষ্টিতে, ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত না হ'লে এবং হারাম কোন ছবি, সঙ্গীত, নারীর চিত্র বা গুনাহের উপাদান না থাকলে এবং কেবল শিক্ষামূলক বা তথ্যভিত্তিক উদ্দেশ্যে হ'লে, এটি মুবাহ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৪০৯)*। আর জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃত রূপ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। VR-এ এগুলোর প্রতিচিত্র দেখানো হয় সম্পূর্ণ মানব কল্পনানির্ভর। তাই এগুলো দেখলে বাস্তব জান্নাত দেখা হবে না, বরং তা কাল্পনিক জিনিস দেখার মত হবে। এটি শরী'আতে নিষিদ্ধ নয়, যতক্ষণ না তা ভ্রান্ত আক্বীদার সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের জন্য যা লুকিয়ে রাখা হয়েছে কোন প্রাণীই তা জানে না' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : আমার একটি ডেকোরেশনের ব্যবসা আছে। মীলাদ বা ওরসের মত বিদ'আতী অনুষ্ঠানের জন্য আমার ডেকোরেশনের বিভিন্ন সামগ্রী (যেমন- মাইক, ফ্যান, সামিয়ানা ইত্যাদি) ভাড়া দেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বৈধ কর্মে ভাড়া দিতে হবে এবং যথাসম্ভব শরী'আত বিরোধী কাজে সহযোগিতা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। আর মীলাদ বা ওরস প্রভৃতি বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে জেনেশুনে সহযোগিতা করা গুনাহের কাজ। অতএব যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করবে ও তাঁর উপর ভরসা করবে। যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা বিকল্প পন্থায় তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন *(তালাক ৬৫/২; বুখারী হা/৫১৬৪; মুসলিম হা/৩৬৭)*। এক্ষণে হালাল এবং শরী'আত সম্মত অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ বা ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সভা-সম্মেলন ইত্যাদি বৈধ কর্মে ভাড়া দেওয়ার পরে যদি কেউ শরী'আত বিরোধী কাজ করে, তবে এর জন্য যারা ভাড়া নিয়েছে তারাই গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : হজ্জব্রত পালনকারীদের জন্য ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করা যরূরী কি?

-মাসঊদ, ঢাকা।

উত্তর : হাজীদের জন্য ঈদের ছালাত সুন্নাত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন মিনাতে কখনো ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করেননি। আর ১০ই যিলহাজ্জ তাকবীর সহ কংকর নিক্ষেপ করা ঈদুল আযহার তাকবীর ও ছালাতের স্থলাভিষিক্ত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৬৯-৭০; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/১৭০; বিস্তারিত দ্রঃ হজ্জ ও ওমরাহ পৃ. ১০৪)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : বিয়ের আক্বদ তথা ঈজাব-কবুল হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন প্রকার নির্জনবাস হয়নি। এমতাবস্থায় যদি তাদের মাঝে তালাক হয়ে যায়, তবে পরবর্তীতে পুনরায় তারা দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি? এক্ষেত্রে নতুন করে বিবাহের নিয়ম, ইদ্দত পালন এবং পূর্বের ও বর্তমানের মোহরানা পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-ইয়াসির আরাফাত, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সহবাস বা নির্জনবাস হওয়ার পূর্বে তালাক হয়ে থাকলে নারীর উপর কোন ইদ্দত নেই এবং সে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে। আর যদি মোহর নির্ধারিত না থাকে, তবে স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী সে সান্ত্বনামূলক উপহার পাবে। এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার (রাজ'আত) সুযোগ থাকবে না; বরং নতুন বিবাহ ও নতুন মোহরের মাধ্যমেই পুনরায় সংসার করা সম্ভব। এক্ষণে ছেলে এবং মেয়ে চাইলে শারঈ নিয়মে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারে।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : ঈদগাহের মাঠে খেলাধূলা সহ বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-রাগীব আহসান, কুমিল্লা।

উত্তর : ঈদগাহের মাঠে বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ও অন্যান্য দিবস পালনার্থে কোন অনুষ্ঠান করা বৈধ নয়। কারণ অমুসলিমদের অনুকরণে পালিত এসব দিবসের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। খেলাধূলা থেকেও দূরে থাকা কর্তব্য। কেননা এতে ঈদগাহের ধর্মীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : ছেলেদের জন্য রূপার আংটি পরিধান করা কি জায়েয?

-যহীরুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : ছেলেদের জন্য রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম রূপার আংটি ব্যবহার করেছেন *(বুখারী হা/৫৮৬৬; ছহীহাহ হা/১১৯২)*। নববী (রহঃ) বলেন, পুরুষের জন্য রূপার আংটি ব্যবহার করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' রয়েছে' *(আল-মাজমূ' ৪/৪৪৪)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'রূপার আংটি ব্যবহার করা সকল ইমামের ঐক্যমত্যে বৈধ। কারণ নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহভাবে প্রমাণিত যে, তিনি রূপার আংটি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ছাহাবীগণও আংটি ব্যবহার করেছিলেন' *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২৫/৬৩)*। উল্লেখ্য যে, পুরুষের জন্য সোনা ভিন্ন অন্য

কোন ধাতু দিয়ে তৈরী অলংকার ব্যবহার করা যাবে না, যদি তা নারীদের সদৃশ হয়। যেমন কানের দুল, চেইন, ব্রেসলেট। এছাড়া কোন ভ্রান্ত আক্বীদা নিয়েও আংটি বা ব্রেসলেট ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : কোন ব্যক্তি যদি বিদেশে থাকেন এবং নিজের দেশে বা অন্য কোন দরিদ্র দেশে টাকা পাঠিয়ে কুরবানী করান, তবে তার কুরবানী আদায় হবে কি?

-নাজীব, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : উত্তম হ'ল ব্যক্তি যে দেশে অবস্থান করছে সেখানেই কুরবানী করা এবং নিজের কুরবানী নিজেই সম্পন্ন করা। কারণ নবী করীম (ছাঃ) এরূপ করেছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) দু'টি ধূসর বর্ণের শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করেছেন। তিনি সেগুলো নিজ হাতে যবেহ করেছেন, বিসমিল্লাহ পড়েছেন, তাকবীর বলেছেন এবং যবেহ করার সময় নিজের পা সেগুলোর পাঁজরের ওপর রেখেছিলেন' *(বুখারী হা/৫৫৫৮; মিশকাত হা/১৪৫৩)*। তবে যদি অন্য কোন দেশে কুরবানী পাঠানোর পিছনে অধিকতর কল্যাণ বা জোরালো কোন কারণ থাকে, তবে তা জায়েয হবে। কুরবানীর নিয়ত করে থাকলে তা কুরবানী হিসাবে আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/১২১৮; ওয়াহবাতুল যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৪/২৭৩)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান 'ফুল সার্ভিস কুরবানী' (পশু কেনা থেকে শুরু করে যবেহ ও প্যাকেটজাত করে পৌঁছে দেওয়া) অফার করে। এক্ষেত্রে পশুর মালিক উপস্থিত না থাকলে বা নিজের হাতে যবেহ না করলে কুরবানীর ছওয়াবে কোন কমতি হবে কি?

-মাহমূদুল হাসান তাজ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উত্তম হ'ল ব্যক্তি নিজের কুরবানী নিজেই সম্পন্ন করবে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) নিজ হাতেই নিজের কুরবানী করতেন *(বুখারী হা/৫৫৫৮; মিশকাত হা/১৪৫৩)*। তবে নিজ হাতে কুরবানী না করতে পারলে বা উল্লেখিত ফুল সার্ভিস কুরবানী সেবা গ্রহণ করলে কুরবানীর ছওয়াবের কোন কমতি হবে না। তবে কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানী যবেহ করার সময় উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব *(মুসলিম হা/১২১৮; ওয়াহবাতুল যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৪/২৭৩)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে বা রাখে না এরূপ ব্যক্তিতে কোম্পানীর পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ খরচ দিয়ে হজ্জ করানোর কোন ফযীলত আছে কি?

-আব্দুল লতীফ, নরসিংদী।

উত্তর : কোনরূপ দুনিয়াবী স্বার্থ ছাড়াই বিশুদ্ধ নিয়তে পাঠালে ছওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন জিহাদে গমনকারীকে প্রস্তুত করে দিল তথা খরচ বহন করল অথবা কোন হজ্জপালনকারীর খরচ বহন করল, অথবা জিহাদে বা হজ্জে গমনকারীর পরিবারের তত্ত্বাবধান করল অথবা কোন ছায়েমকে ইফতার করালো, তার জন্য তা (জিহাদ, হজ্জ বা ছিয়াম) পালনকারীর অনুরূপ নেকী রয়েছে। যা থেকে সামান্য পরিমাণ নেকীও কমতি করা হবে না *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৬৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭৮)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : হজ্জ ফরয হওয়া ব্যক্তি কেবল ওমরাহ পালন করলে তার হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে কি?

-আব্দুল মান্নান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হজ্জ ও ওমরা দু'টি পৃথক ইবাদত। একটি আরেকটির স্থলাভিষিক্ত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর' *(বাকারাহ ২/১৯৬)*। লাক্বীত ইবনে আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি হজ্জ ও ওমরাহ করতে অক্ষম। এমনকি সফর করতেই অক্ষম। তিনি বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ হ'তে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন কর *(ইবনু মাজাহ হা/২৯০৬; আবুদাউদ হা/১৮১০; মিশকাত হা/২৫২৮)*। অতএব কেবল ওমরাহ পালন করলে, হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : পৃথিবী সমতল নাকি গোলাকার? এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন প্রমাণ আছে কি?

-আব্দুর রহমান, দিনাজপুর।

উত্তর : সূরা যুমার ৫, ক্বাফ ৯, লোকমান ২৯, নাযি'আত ৩০ প্রভৃতি আয়াত সমূহ পৃথিবী গোলাকার হওয়ার প্রমাণ বহন করে। উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ বলেন, يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ 'তিনিই দিবসের উপর রাত্রিকে এবং রাত্রির উপর দিবসকে আবেষ্টনকারী বানিয়েছেন' *(যুমার ৫)*। كَوْرٌ অর্থ গোল বানানো, মাথায় পাগড়ী পেচানো। এটাই পৃথিবী গোল হওয়ার অন্যতম প্রধান কুরআনী দলীল। কারণ এক দেশে যখন সূর্য অস্ত যায়, অন্য দেশে তখন সূর্যের উদয় হয়, এটাই পৃথিবীর গোলত্বের অকাট্য প্রমাণ। যা কুরআন বহু পূর্বে পেশ করেছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا 'আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃত করে দিয়েছি' *(ক্বাফ ৭)*। অর্থাৎ যা সর্বদা বিস্তৃত ও প্রশস্ত। মানুষ সারা জীবন চলতে থাকলেও পৃথিবীকে প্রশস্তই পাবে। আর এই অব্যাহত প্রশস্ততা কেবল তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবী গোল হয়। অন্য কোন আকৃতির হলে তা সম্ভব হবে না। কেননা সে সময় তাকে একটা না একটা সীমান্তে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু কোন প্রান্তসীমা পাওয়া বা সেখানে গিয়ে কোন গভীর গহ্বরে পড়ে যাওয়ার মত কখনো ঘটেনি'। বস্তুতঃ 'পৃথিবী গোলাকার' এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার অন্ততঃ এগারশ' বছর পূর্বে কুরআন মজীদই সর্বপ্রথম তা উপস্থাপিত করেছে' *(আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব পৃঃ ২৬৯-২৮০)*।

ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) সূরা যুমার ৫ আয়াত থেকে দলীল দিয়ে বলেন, 'নেতৃস্থানীয় বিদ্বানগণের কেউই পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। কিংবা এর বিরুদ্ধে তাদের কারু থেকে কোন বক্তব্য জানা যায়নি। বরং কুরআন ও হাদীছে এর গোলাকার হওয়ার পক্ষেই দলীল এসেছে *(ইবনু হাযম, আল-ফিছাল ফিল*

মিলাল ১/৩৫২ 'পৃথিবী গোলাকার হওয়া' অনুচ্ছেদ)।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বিখ্যাত বিদ্বান আবুল হুসায়েন আহমাদ বিন জাফর (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তিনি বলেন, এর প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, 'পৃথিবীর কোন প্রান্তে সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্ররাজি একই সময়ে উদিত হয় না বা অস্তও যায় না। বরং পশ্চিমের আগে তা পূর্বে উদিত হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/১৯৫)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ভিত্তিতে কারো কুফুরী দেখার পর তাকে কাফির মনে করা বা বলা যাবে কি?

**-সজীব, রাজশাহী।*

[আরবীতে সুন্দর ও ইসলামী নাম রাখুন! (স.স.)]

উত্তর : ব্যক্তিগত ইজতিহাদ মোতাবেক কারো বাহ্যিক আচরণ দেখে তাকে নিজ উদ্যোগে কাফির মনে করা বা ঘোষণা করা জায়েয নয়। স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হওয়া, কুরআন এবং সুন্নাহ্র স্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করা বা অমান্য করা ইত্যাদি বিষয় পাওয়া গেলে কাফির বলা যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে বলে, হে কাফির! এ কথা দু'জনের একজনের দিকে ফিরে যায়' *(বুখারী হা/৬১০৩; মুসলিম হা/৬০)*। অর্থাৎ যার দিকে অভিযোগ যদি তা সত্য না হয়, তবে তা অভিযোগকারীর উপর ফিরে আসে যা অত্যন্ত ভয়াবহ। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেছেন, 'কাউকে কাফের হিসাবে সাব্যস্ত করার (তাকফীর) রায় দেওয়ার আগে দু'টি বিষয় দেখা ওয়াজিব- ১. কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা এটি প্রমাণিত হওয়া যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কুফরী। যাতে আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা না হয়। ২. সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর উক্ত হুকুমটি কার্যকর হয় কি-না তা যাচাই করা। অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে তাকফীরের শর্তসমূহ পূর্ণ হ'তে হবে এবং তাকফীরের পথে বাধা প্রদানকারী বিষয়গুলো অনুপস্থিত থাকতে হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১৩৪)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আমলের ক্ষেত্রে কেউ ইজতিহাদ করে ভুল করে থাকলে সেটি অপরাধ নয়। কিন্তু আক্বীদাগত মাসআলার ক্ষেত্রে অনেক মানুষ ভুলকারী মাত্রই কাফের সাব্যস্ত করে। অথচ এই ধরনের বক্তব্য ছাহাবী, তাবেঈ কিংবা মুসলিম ইমামগণের কারো থেকে জানা যায় না; বরং এটি বিদ'আতীদের বক্তব্য *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩৯)*। তিনি আরো বলেন, আমি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে কাফের, ফাসেক বা পাপী হিসাবে সাব্যস্ত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করি; যতক্ষণ না এটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তার উপর 'হুজ্জাতে রিসালাত' (রাসূলের আনীত অকাট্য দলীল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/২২৯)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আমীনুল ইসলাম, পাজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তর : উভয় ঈদের দিন ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/১৯৯১, মুসলিম হা/১১৩৭, মিশকাত হা/২০৪৮)*। এছাড়া আইয়ামে তাশরীক্ব তথা ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিনও ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/১১৪১, মিশকাত হা/২০৫০; আবুদাঊদ হা/২৪১৯)*। তবে কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত *(তিরমিযী হা/৫৪২, মিশকাত হা/১৪৪০)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : হজ্জ থেকে ফিরে আসা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যাবে কি?

-আহমাদ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কোন দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে আসার পর এরূপ আয়োজন করা যায়। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গাভী যবহ করেন *(বুখারী হা/৩০৮৯; মিশকাত হা/৩৯০৫)*। হাদীছটির ব্যাখ্যায় ত্বীবী বলেন, সফর থেকে ফেরার পর সক্ষমতা অনুযায়ী মেহমানদারী করানো সুন্নাত *(ত্বীবী, শরহ মিশকাত হা/৩৯০৫-এর ব্যাখ্যা; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩৮৮; নববী, আল-মাজমূ' ৪/৪০০)*। তবে এটিকে রেওয়াজে পরিণত করলে বিদ'আত হবে। আর হজ্জ ব্যবসায় প্রসারের লক্ষ্যে এটা করলে নেকী থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : ছোটবেলায় পিতা-মাতার বিচ্ছেদের পর গত ২৬ বছর যাবৎ মায়ের সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই এবং আমি বাবার সাথেই থাকি। মা এখন অন্যের ঘরসংসার করছেন। এমতাবস্থায় জন্মদাত্রী হিসাবে তাঁর প্রতি আমার কোন শারঈ দায়িত্ব আছে কি?

-আব্দুল্লাহ, বরিশাল।

উত্তর : জন্মদাত্রী মা যেখানেই অবস্থান করুক মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তার সেবা করতে হবে। মাতৃত্ব একটি স্থায়ী বংশীয় সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি সদাচরণ করা ওয়াজিব। এর মধ্যে তাঁর খোঁজখবর নেওয়া, তাকে আর্থিক সহায়তা করা অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩)*। তিনি আরও বলেন, 'আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে' *(লোকমান ৩১/১৪)*। তিনি আরও বলেন, 'আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। যখন নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মধ্যে কে আমার কাছে উত্তম সাহচর্য পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা *(মুসলিম হা/২৫৪৮)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : হজ্জ বা ওমরায় গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা আবশ্যক কি?

-মেহেদী হাসান, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : আবশ্যক নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত হজ্জ বা ওমরার কোন অংশ নয়। শায়খ বিন বায বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব নয় বা হজ্জের কোন শর্তও নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১১১)*। উল্লেখ্য যে, হজ্জের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে যতগুলি বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলি যঈফ অথবা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫-৪৭; দ্রঃ 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই ১৩৯-৪০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : জন্মের কয়েক ঘন্টা পর বাচ্চা মৃত্যুবরণ করলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-রোমেন, সঊদী আরব।

উত্তর : সপ্তম দিনের পূর্বে সন্তান মারা গেলেও তার আক্বীক্বা দেওয়া মুস্তাহাব। কারণ সন্তান মাতৃগর্ভে চার মাসের বেশি অবস্থান করলে জীবন, রিযিক ও আয়ু লাভ করে এবং মানুষ হিসাবে গণ্য হয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৪৪৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে' *(আবুদাউদ হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪১৫৩)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, এটি সন্তানের শাফা'আতের বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি মনে করেন, যদি সন্তানের আক্বীক্বা না করা হয় অতঃপর সে শিশু অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে সে তার পিতা-মাতার জন্য শাফা'আত করবে না *(ফাৎহুল বারী ৯/৫৯৪)*। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, যদি (সন্তান) সপ্তম দিনের আগেও মারা যায়, তার পক্ষ থেকে আক্বীক্বা করতে হবে' *(মুহাল্লা ৬/২৩৫; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২২৬)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : হজ্জব্রত পালনকালে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাংখীদের সাথে মোবাইলে, ভিডিও কলে যোগাযোগ রাখা যাবে কি?

-ইমরান হোসাইন, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : তাদের সাথে যোগায়োগে কোন বাধা নেই। তবে ত্বাওয়াফ ও সাঈ চলাকালীন সময়ে বিরত থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ ছালাতের মতই। অতএব তোমরা সেখানে অল্প কথা বল *(নাসাঈ হা/২৯২২; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৫৪)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : হজ্জব্রত পালনকালে মহিলারা অলংকার ব্যবহার করতে পারবে কি?

-আকলিমা, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : হজ্জ পালনকালে মহিলাদের অলংকার ব্যবহারে কোন বাধা নেই। তবে এ সময় যেন তা পরপুরুষেরা দেখতে না পায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ অলংকার নারী সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/১৯২; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২০১)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : অসুস্থতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নে'মত না পাপের ফল? এটা বুঝার উপায় কি?

-আল-আমীন, টাঙ্গাইল।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সুখ-দুঃখ এবং সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। কখনও তিনি তাদের পরীক্ষা করেন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং নেকী বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। যেমনটি তিনি নবী-রাসূল ও নেককার বান্দাদের ক্ষেত্রে করে থাকেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী (মর্যাদাবান), এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী' *(তিরমিযী হা/২৩৯৮; মিশকাত হা/১৫৬২, সনদ হাসান)*। আবার কখনও আল্লাহ এটি করেন গুনাহ ও পাপাচারের কারণে, যাতে দুনিয়াতেই দ্রুত শাস্তি প্রদান করা হয়। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই কর্মফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন' *(শূরা ৪২/৩০)*।

সারকথা হ'ল, পরীক্ষা বা বালা-মুছীবত কখনও মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিপুল ছওয়াবের জন্য হয়, যেমনটি আল্লাহ নবীগণ এবং একনিষ্ঠ নেককারদের সাথে করেন। আবার কখনও এটি গুনাহ মাফের জন্য হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে কেউ মন্দ কাজ করবে তাকে তার ফল দেওয়া হবে' *(নিসা ৪/১২৩)*। আর নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কোন দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, ক্লান্তি, রোগ, শোক কিংবা যাতনা আসুক না কেন, এমনকি তার গায়ে যদি একটি কাঁটাও ফোটে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন' *(আহমাদ হা/১১২০৪, সনদ ছহীহ)*। নবী করীম (ছাঃ) আরও বলেছেন, 'আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে তিনি বিপদে ফেলেন' *(বুখারী হা/৫৬৪৫; মিশকাত হা/১৫৩৬)*।

আবার কখনও এই পরীক্ষা গুনাহের কারণে এবং দ্রুত তওবা না করার ফলে দ্রুত শাস্তি হিসাবে নেমে আসে। যেমনটি নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন দুনিয়াতেই তার (গুনাহের) শাস্তি দিয়ে দেন। আর যখন তিনি তাঁর কোন বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার গুনাহের শাস্তি থেকে তাকে বিরত রাখেন, যাতে ক্বিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি প্রদান করতে পারেন' *(তিরমিযী হা/২৩৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৩০৮)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : কুরআন মাজীদ মুখস্থ পড়ায় এক হাযার এবং দেখে পড়ায় দুই হাযার নেকী হয়। এর সত্যতা আছে কি?

-মামূন, নলতা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৬৭; যঈফুল জামে' হা/৪০৮১)*। এছাড়া কুরআন দেখে পড়া বা মুখস্থ পড়ার মধ্যে ছওয়াবের পার্থক্যের বিষয়ে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। এবিষয়ে যত হাদীছ আছে সবগুলিই যঈফ ও জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৬, ৪০১১)*। মূলতঃ কুরআন অনুধাবন সহকারে পাঠ করতে হবে *(ছোয়াদ ৩৮/২৯; মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। যিনি যতবেশী অনুধাবন করবেন এবং তা বাস্তবে আমল করবেন, তিনি ততবেশী নেকীর অধিকারী হবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٢٩ العدد : ٨ ذوالقعدة و ذوالحجة ١٤٤٧ هـ/ مايو ٢٠٢٦
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

PRESIDENT HOMES LTD.

প্রেসিডেন্ট হোমস্ লিমিটেড

বাড়ী নং ৩১, রোড নং ৩, নিকুঞ্জ-১, ঢাকা-১২২৯।

জলসিঁড়ি আবাসনে আভিজাত্যের ঠিকানায় আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট!

প্রকৃতির স্নিগ্ধতা আর আধুনিক
নাগরিক সুবিধার এক অপূর্ব মেলবন্ধনে

প্রেসিডেন্ট হোমস্ লিমিটেড
President Homes Ltd.

নিয়ে এসেছে এক দৃষ্টিনন্দন
আবাসন প্রকল্প।

ব্যস্ত ঢাকা শহরের বুকে শান্ত,
নিরাপদ ও স্মার্ট পরিবেশে নিজের
একটি স্থায়ী ঠিকানা খুঁজছেন?
তাহ'লে আমাদের এই আধুনিক
প্রকল্পটি আপনার জন্যই।

আমাদের প্রকল্পের বিশেষত্ব

- **লোকেশন :** জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে পরিকল্পিত এবং আধুনিক স্মার্ট সিটি।
- **স্থাপত্যশৈলী :** আধুনিক এবং শৈল্পিক ডিজাইনে তৈরি। +৯ তলা ভবন।
- **সবুজ পরিবেশ :** ভবনের ছাদে চমৎকার ল্যান্ডস্কেপিং এবং প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলের সুবিধা।
- **নিরাপত্তা :** ২৪ ঘন্টা সিসিটিভি ক্যামেরা ও প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মী।
- **পার্কিং :** প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য পার্কিং সুবিধা।
- **অন্যান্য সুবিধা :** আধুনিক লিফট, জেনারেটর ব্যাকআপ এবং উন্নতমানের ফিনিশিং ম্যাটেরিয়াল।

মোবাইল : ০১৭১১৮১৭৩১৪, ০১৭১১৭২২৩০১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 29, Issue 8, May 2026

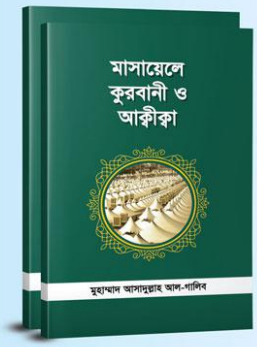

যুলহিজ্জাহ মাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ইবাদত হ'ল হজ্জ ও কুরবানী।

যেকোন ইবাদত কবুলের অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া। সমাজে প্রচলিত যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি এড়িয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আপনার হজ্জ, ওমরাহ, কুরবানী ও আক্বীকার বিশুদ্ধ মাসায়েল জানতে আজই সংগ্রহ করুন।

অর্ডার করুন ✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০ | হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

Bangladesh EYE HOSPITAL Rajshahi Ltd.
Eye Care, We Care

বাংলাদেশ আই হসপিটাল রাজশাহী লিমিটেড

চোখের যত্নে বিশ্বস্ত ঠিকানা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চক্ষু হাসপাতাল 'বাংলাদেশ আই হসপিটাল'-এর নতুন শাখা এখন রাজশাহীতে

এখানে সকাল ৮-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখছেন প্রায় ২৫-৩০ জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চোখের সকল জটিল ও সাধারণ সমস্যার জন্য এখানে রয়েছে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ চক্ষু চিকিৎসা সেবা।

সেবাসমূহ

ছানি (ফ্যাকো) অপারেশন, গ্লুকোমা চিকিৎসা, রেটিনা ও ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, কর্নিয়া ও চোখের সংক্রমণ, শিশুদের চোখের রোগ ও স্কুইন্ট (ট্যারা), অকুলোপ্লাস্টিক (Oculoplastic) সেবা (চোখের পাতা, চোখের চারপাশ ও টিয়ার ডাক্ট), চশমা ও কনট্যাক্ট লেন্স এবং চোখের সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে সর্বাধুনিক মেশিনারিজ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশ এবং সাশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসা।

যোগাযোগ

আই টেন টাওয়ার, এয়ারপোর্ট রোড, ওমরপুর, আমচত্বর
রাজশাহী-৬২০৩। মোবাইল : ০৯৬৪৩১২৩১২৩